1963

PRESENTED

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

১৩৭০

CA-36

ID = 439N12_CA-36

093.7
P926

093.1
P926

36

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ

সম্পাদক
শ্রীবাদল মুখোপাধ্যায়
শ্রীমিহিররঞ্জন ভট্টাচার্য

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
PRESENTED
16 OCT 1963
CALCUTTA

আশ্বিন ১৩৭০ অক্টোবর ১৯৬৩

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক শ্রীঅশীনরঞ্জন দাশগুপ্ত (সভাপতি)

" শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

" শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীবাদল মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)

শ্রীমিহিররঞ্জন ভট্টাচার্য (")

শ্রীঅলক মুখোপাধ্যায় (কর্মসচিব)

ছবির ব্লক করেছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Published by Dr. Sanat Kumar Basu, Principal, Presidency College, 86/1 College Street, Calcutta-12 and Printed by him at Navana Printing Works Private Ltd., 47 Ganesh Chunder Avenue, Calcutta-13

সূ চি প ত্র

সমন্বয়	১	তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : তাঁর স্বদেশচিন্তা	৯	অমিয় বসু
বের্টোল্ট ব্রেখ্ট : কবি ও নাট্যকার	১৪	জিষ্ণু দে
স্বদেশচিন্তা : বাংলা সাহিত্যে	২০	পিনাকী গুপ্তভায়া
হিসাব-নিকাশ	২৪	বাদল মুখোপাধ্যায়
চ্যারিটি ফাণ্ড	২৭	চন্দ্রাবলী নাগ
দুটি জর্মন কবিতা	৩১	সুজিতশংকর চট্টোপাধ্যায়
সাতশো রজনীর অভিনয়	৩২	সুমিত মিত্র
দুটি কবিতা	৩৩	অতীশকুমার দাশগুপ্ত
অগ্রজার নির্দেশ	৩৫	মালিনী বসু
নায়ককে প্রচ্ছন্ন রেখে	৩৬	দীপংকর দাশগুপ্ত
ঐতিহাসিক টনি	৩৮	অধ্যাপক সুবোধকুমার মজুমদার
কলারসিক	৪৬	শিবানী রায়চৌধুরী
পুস্তক-পরিচিতি	৫০	অধ্যাপক অরুণকুমার মজুমদার
লেখক-পাঠকের প্রতি	৫১	
আমাদের কথা	৫৩	
সাধকপীঠ প্রেসিডেন্সি কলেজ : ১৯৬৩	৬৫	অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র
লেখক-পরিচিতি	৬৬	

The Diagnosis of Dr. Bernier	1	Saurin Roy
The New 'Mistress' of Theoretical Physics	6	Kalyan Kumar Mukherjea
And It Grew Wondrous Cold	10	Avijit Gupta
Crucifixion	13	Dipanjan Roychowdhury
Simposium : *The two Cultures and I*	16	Amitava Bagchi Ranu Guha Surja Sankar Roy Mukul Kumar Majumdar Dipanjan Roychowdhury
The Present State of Government Statistics in India	22	S. Subramanian
Two Films and two Epochs	27	Jayabrata Bhattacharya
MOZART : *the early rebel*	31	Uma Dasgupta
Department of English	37	
Farewell to Dr. Bhabatosh Datta	39	
Visitors from Abroad in 1962-63	40	
Obituary	41	
Contributors	44	

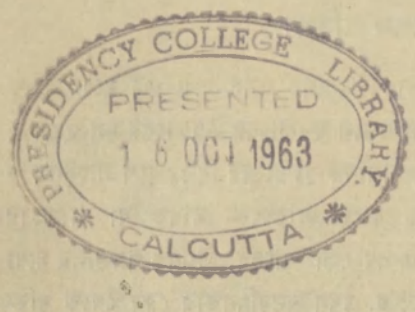

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY
PRESENTED
16 OCT 1963
CALCUTTA

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা
আশ্বিন ১৩৭০ অক্টোবর ১৯৬৩

সমন্বয়

ই. এম. ফরস্টার

ভূমিকা ও অনুবাদ : তীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়

[জীবিতকালেই বিস্মৃতপ্রায় এডোয়ার্ড মর্গান ফরস্টার (১৮৭৯—) একাধিক কারণে ইংরেজী কথাসাহিত্যে স্থায়িত্বের দাবি রাখেন। প্রবন্ধ, সমালোচনা, জীবনী এবং অন্যান্য বিবিধ রচনা লিখে থাকলেও প্রধানত কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তিনি বরণীয়। কিন্তু তাঁর প্রণীত গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা বিস্ময়জনকভাবে সীমাবদ্ধ; তিনি সাকুল্যে পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন, এবং তাঁর গল্পসংগ্রহে স্থান পেয়েছে মাত্র বারোটি গল্প। এর মধ্যে একটি উপন্যাস বাদে বাকি সবই প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী। সুতরাং আজকের বহুপ্রজ ও বহুসংস্করণধারী কথাসাহিত্যিকদের আসরে ফরস্টারকে হারিয়ে যেতে দেয়া তরুণদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

বিশেষত, ফরস্টারের মধ্যে কোথাও চমক নেই। তাঁর সময়ের প্রচলিত সাহিত্য-রীতিকে কোথাও তিনি লঙ্ঘনের প্রয়াস পান নি। তার ব্যঞ্জনাসামর্থ্য চরিত্র-চিত্রণে ও কথোপকথনে স্বপ্রকাশ, তার জন্য তিনি কোনো দুরূহ কলাকৌশলের আশ্রয় খোঁজেন নি। তাঁর ভাষাশৈলী পরিচ্ছন্ন ও বাহুল্যবর্জিত। এমন কি নিবিড় অনুভূতির মুহূর্তেও তার স্বর উচ্চগ্রামে ওঠে না; উঠলেও, তার আগে থাকে প্রস্তাতর ক্রমবিন্যাস, যা পাঠকের অজ্ঞাত-সারেই প্রভাবশালী। তাঁর হাস্যরস কখনও সচকিত করে না, কখনও ধরাশায়ী করে না তাঁর ব্যঙ্গ, কিন্তু এ-দুটিই মোলায়েমভাবে তাঁর ভাষায় সক্রিয়।

ফলত, তাঁর পক্ষে জনপ্রিয়তা দুলভ্য। কিন্তু সহৃদয় পাঠক এই উপরিগত উপস্থাপন থেকেই বুঝে নেবেন যে ফরস্টারের মানস এত ঋদ্ধ, এত প্রোথিতমূল তার প্রত্যয়, যে বাহ্যিক আড়ম্বর তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজন। বিশেষত, তাঁর গল্প-উপন্যাসে সর্বদাই ব্যক্ত নগরশোভন আড়ম্বরের নিদারুণ রিক্ততা। গল্পগুলিতে এর অভিব্যক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

কারণ এই ফ্যাণ্টাসি বা কল্পকথাগুলি পরিপক্কতার পূর্বযুগের ফসল এবং এর মধ্যে কতক কেবল পরীক্ষা হিসেবেই গ্রাহ্য। কিন্তু তবু গল্পগুলি পড়লে ফর্‌স্টারের উপন্যাসের মূল সূত্রসমূহ স্পষ্ট লাগে। যুক্তির ওপরে উপলব্ধির সংস্থাপন, মানসিক দারিদ্র্যের বিকল্পরূপে সহিষ্ণুতা ও 'ব্যক্তিগত সম্পর্কে'র গুণকীর্তন, নির্বিবেক ধনীর হাতে আশুবেদন নায়ক বা নায়িকার ঐচ্ছিক নিগ্রহভোগ ও তজ্জাত জীবনবোধ,— এ-সব তো আছেই, উপরন্তু গল্পগুলির মধ্যে প্রায়ই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এক 'সনাতন মুহূর্তে'র, যখন বস্তুমুখিনতার ক্লেদ থেকে মুক্তি পেয়ে আধুনিক মানুষ চিনে নিতে পারে এক বৃহত্তর জীবনকে, যার নিদর্শন রিংশ শতাব্দী কোথাও রাখে নি, যাকে খুঁজতে হবে গ্রীস-রোমের পুরাণে। ফর্‌স্টারের নায়ক বা নায়িকা অবশ্য বুদ্ধি দিয়ে কখনও খোঁজে না; সেই সনাতন মুহূর্ত তাদেরই রূপান্তরিত করে এক-একটি পৌরাণিক চরিত্রে। ফলে প্রতিবেশীরা তাদের না বুঝলেও, সার্থকতায় তারা বঞ্চিত থাকে না। বর্তমান গল্পটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিগুলির অন্যতম নয় বটে, কিন্তু এখানেও ফর্‌স্টারকে চিনে নিতে দেরী হয় না। প্রৌঢ়া মিস হ্যাডন সমুদ্রকে আপন ক'রে পেয়ে বেটোফেন উপলব্ধি করেন, শত শিক্ষণেও যা ছিল অসম্ভব; আর শিক্ষাপরিষদের আরোপিত বিধি-বিধানকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে সহজ আর স্বাভাবিক আনন্দে গোটা স্কুল নিজেরাই নিজেদের অস্টারলিজ গ'ড়ে তোলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গল্পগুলির রচনাকালে, অর্থাৎ এই শতকের আদিতে, কল্পকথা ছিল একটি সুপরিচিত মাধ্যম। কিন্তু মাধ্যম-নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় থাক বা না থাক, ব্যবহারে ফর্‌স্টারের স্বকীয়তা পরিস্ফুট। রূপক কাহিনীতে অস্বাচ্ছন্দ্য আনে; কিন্তু তাঁর হাতে সুনিপুণ সংমিশ্রণ ঘটেছে আজগুবি, পৌরাণিক ও বর্তমানের। উদাহরণত উল্লেখ্য বেটোফেন, নেপোলিয়ন, মেফিস্টোফেলিস ও রাফেল, যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই এ-কাহিনীর চরিত্র-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। পাঠক যদি কোথাও অস্বস্তি পান, তবে তার মূলে লেখকের স্খলন-পতন-ত্রুটি ততটা নেই, যতটা আছে অনুবাদকের অক্ষমতা।]

'হাত চাপড়িও না,' মিস হ্যাডন বললেন। 'আর প্রত্যেকবার হাত চলবে একেবারে মুক্তোর মালার মতো একটানা। তা তো হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না?'

'এলেন, এই উল্লুক, আমার চাবিটা টিপলি কেন?'

'মোটেই না। তুই-ই তো আমার চাবিটা টিপলি।'

'এই চাবিটা তবে কে টিপবে?'

'মিল্‌ড্রেড,' দু-জনের বিনুনির ফাঁক দিয়ে দেখে নিয়ে রায় দিলেন মিস হ্যাডন। 'আবার ডবল বার ধর। হাত চাপড়িও না ফের।'

আবার ধরল মেয়ে দুটি, এবং আবার 'পা'-তে এসে মিল্‌ড্রেডের ডান হাতের ক'ড়ে আঙুলের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হ'ল এলেনের বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙুলের।

'হয় না,' তারা বলল। 'যে লোকটা লিখেছিল, তারই দোষ।'

'খুব হয়, এলেন যদি ধ'রে না রাখ অতক্ষণ,' মিস হ্যাডন বললেন।

চারটে বাজল। মিল্‌ড্রেড আর এলেন চ'লে গেল, রোজ আর এনিড্ এল তাদের জায়গায়। তাদের দ্বৈত বাজনা মিলড্রেডের চেয়ে খারাপ, কিন্তু এলেনের মতো অত খারাপ নয়। সাড়ে চারটেয় এল ডলরেস্ আর ভায়োলেট। তাদের বাজনা এলেনের থেকেও খারাপ। পৌনে পাঁচটায় মিস হ্যাডন অধ্যক্ষার সঙ্গে চায়ে বসলেন। অধ্যক্ষা বুঝিয়ে বললেন কেন তিনি চান যে সব ছাত্রী একই দ্বৈত সুর বাজাতে শিখুক। সে বছর স্কুলে একটাই বিষয় পড়ানো হচ্ছিল, মাত্র একটা— নেপোলিয়ন— এবং সমস্ত পাঠ্যক্রম ঐ একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেই এগোবে। ফরাসী আর ইতিহাসের কথা তো বলাই বাহুল্য; আবৃত্তির ক্লাসে শেখানো হচ্ছে 'ওঅর এ্যাণ্ড পীস'-এর কোনো-কোনো অংশ, অঙ্কনের ক্লাসে ডেভিডের একটা ছবির প্রতিলিপি আঁকানো হচ্ছে, সেলাই-এর ক্লাসে শেখানো হচ্ছে এম্পায়ার গাউনের প্রস্তুতি, আর গানের ছাত্রীরা,— তারা তো অবশ্যই বাজিয়ে অভ্যাস করছে বেটোফেনের 'এরোয়িকা' সিম্ফনী, যেটি সম্রাটের সম্মাননার জন্যে আরব্ধ হয়েছিল, যদিও শেষ করা হয় নি। অন্য শিক্ষিকাদের মধ্যে কয়েকজন চা-চক্রে ছিলেন। তাঁরা সোচ্ছ্বাসে জানালেন সমন্বয় করাতে তাঁরা কী ভালোবাসেন, আর কত সুন্দর এই পদ্ধতিটি: তাঁদের, এবং মেয়েদেরও, কাজে এত উৎসাহ দেয়! কিন্তু মিস হ্যাডন এতে যোগ দিলেন না। তার সময়ে সমন্বয় ব'লে কিছু ছিল না, ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি শুধু জানেন যে তিনি বুড়ো হ'য়ে পড়ছেন, নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হচ্ছে তাঁর সংগীত-শিক্ষণ। কবে যে অধ্যক্ষা তা বুঝতে পেরে তাঁকে বরখাস্ত করবেন কে জানে, তিনি ভাবলেন।

ইতিমধ্যে, সেই ঊর্ধ্বে দ্যুলোকে ব'সে রয়েছেন বেটোফেন, আর তাঁর চতুর্দিকে ক্ষুদ্রতর মেঘরাজিতে বিন্যস্ত হ'য়ে, তাঁর কেরানীরা। তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি লেজার খাতা ভরিয়ে তুলছেন। যাঁর খাতার ওপর লেখা আছে "এরোয়িকা" সিম্ফনী, কার্ল ম্যলর কর্তৃক চারি হস্তের জন্য প্রস্তুত', তিনি লিখলেন: '৩টা ৪৫মিঃ, মিল্‌ড্রেড ও এলেন; পরিচালিকা, মিস হ্যাডন। ৪টা, রোজ ও এনিড; পরিচালিকা, মিস হ্যাডন। ৪টা ১৫মিঃ, মার্গারেট ও জেন; পরিচালিকা, মিস হ্যাডন। ৪টা ৩০—'

বেটোফেন বাধা দিলেন। 'কে এই মিস হ্যাডন,' তিনি শুধোলেন, 'যার নাম ঢাকের বোলের মত বার-বার ফিরে-ফিরে আসছে?'

'তিনি বহু বৎসর যাবৎ আপনাকে উপস্থাপিত করেছেন।'

'এবং তাঁর সম্প্রদায়?'

'তারা হ'ল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর তরুণীরা। তারা তাঁর সামনে প্রতিদিন এবং সারাদিন "এরোয়িকা" বাজায়। যে-ধ্বনি কখনও স্তব্ধ হয় না। ধূপের সুরভির মতো ক্রমাগতই তা জানালার বাইরে ভেসে যায়, শোনা যায় রাস্তার আনাচে-কানাচে।'

'ওরা কি অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বাজায়?'

বেটোফেন তো বধির, কাজেই কেরানীটি বলতে পারলেন, 'হ্যাঁ, নিবিড়তম অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে। এক সময়ে অন্যদের তুলনায় এলেন আপনার আত্মার সন্নিধি থেকে দূরে ছিল, কিন্তু ডলরেস্ আর ভায়োলেট আসার পর আর সে অবস্থা নেই।'

'বুঝতে পেরেছি। নতুন সঙ্গীরা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে।'

কেরানীটি চুপ ক'রে থাকলেন।

'আমি অনুমোদন করছি,' বেটোফেন বলতে লাগলেন, 'এবং আমার অনুমোদনের নিদর্শনস্বরূপ নির্দেশ দিচ্ছি, যে মিস হ্যাডন ও সম্প্রদায় এবং সেই প্রতিষ্ঠানের আর সকলে আজ সন্ধ্যাতেই আমার "এ মাইনর কোয়ার্টেট্"-এর একটি নিখুঁত রূপায়ণ শুনতে পাবে।'

নির্দেশটি যতক্ষণে লিখিত হচ্ছে এবং কর্মচারীরা যতক্ষণে ভাবছেন কীভাবে সেটি কার্যকর হবে, ততক্ষণে আরো দ্যুতিময় একটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে অমরার আর-এক কোণে। সেখানে নেপোলিয়ন ব'সে আছেন কেরানী পরিবেষ্টিত হ'য়ে; তাঁরা সংখ্যায় এত বেশী যে দূরতম সিংহাসনগুলি দেখতে পুঞ্জ মেঘের থেকে বড় নয়। মর্ত্যলোকে তাঁদের মনিবের কথা যতবার উল্লিখিত হচ্ছে, সেই সব খাতায় তুলতে তারা ব্যস্ত; এই কাজের জন্যে তিনি স্বয়ং তাঁদের সংগঠিত করেছেন। কয়েক মুহূর্ত অন্তর তিনি জিজ্ঞেস করছেন, 'আমাদের সর্বশেষ অবস্থা কী?'

যে-কেরানীর খাতার শিরোনাম 'ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্ রচিত প্রশস্তিসমূহ,' তিনি জবাব দিলেন: '৫টা, মিল্‌ড্রেড এলেন, রোজ, এনিড, মার্গারেট, জেন, প্রত্যেকে আবৃত্তি করেছে "একদা যে করবন্ধ রেখেছিল প্রোজ্জ্বল প্রাচীরে" শীর্ষক চতুর্দশপদী। ডলরেস্ ও ভায়োলেট আবৃত্তির চেষ্টা ক'রে বিফল হয়েছে।'

সম্রাট বললেন, 'কবি ওখানে আমার ভেনিশীয় গণতন্ত্র বিজয়ের বন্দনা গাইছেন। বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব ডলরেস্ আর ভায়োলেটকে অভিভূত করেছে। তাদের বিফলতা স্বাভাবিক। পরবর্তী অবস্থা?'

আর একজন কেরানী বললেন, '৫টা ১৫, মিল্‌ড্রেড, এলেন, রোজ, এনিড, মার্গারেট আর জেন, পলাহন বোনাপার্টের গদীমোড়া আসনের সামনের দিকের বাঁ-পায়ার ছবি আঁকছে। ডলরেস্ ও ভায়োলেট এখনও চতুর্দশপদী কণ্ঠস্থ করছে।'

নেপোলিয়ন বললেন, 'এই সুন্দর নামগুলি আগেও শুনেছি মনে হচ্ছে।'

'ওগুলো আমার লেজারেও রয়েছে,' তৃতীয় একজন কেরানী বললেন। 'হুজুরের স্মরণ থাকতে পারে, এরা এক ঘণ্টা আগে বেটোফেনের "এরোয়িকা" বাজিয়েছে—'

'যেটি আমার সম্মানার্থে লেখা', সম্রাট শেষ করলেন কথাটি। 'আমি অনুমোদন করছি।'

'৫টা ৩০', চতুর্থ কেরানী বললেন, 'ডলরেস্ আর ভায়োলেট পেন্সিল ছুলতে গেছে, তারা বাদে আর সবাই "*Marseillaise*" গাইছে।'

'কেবল এইটুকুই দরকার ছিল', নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললেন। 'এই কুমারীরা উদ্দীপনার সঙ্গে মহিমার পথে প্রাগ্রসর। প্রতিদানস্বরূপ, আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে তারা এবং তাদের প্রতিষ্ঠানের সকলে কাল সকালে অস্টারলিজ়-বিজয়োৎসবে অংশ নেবে।'

নির্দেশ খাতায় তোলা হ'ল।

সাড়ে সাতটায় সান্ধ্য প্রস্তুতি। মেয়েরা গোমড়ামুখে পড়তে বসল, কারণ ইতিমধ্যেই এই নতুন পদ্ধতির একঘেয়েমিতে তাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল একটা। স্কুলের সামনে দিয়ে চ'লে গেল একদল অশ্বারোহী সৈন্য, আর তাদের আগে আগে তোফা এক বাদ্যসমবায়। আনন্দের চোটে মেয়েদের মাথা খারাপ হ'য়ে গেল। আসন থেকে লাফিয়ে উঠে তারা গান গেয়ে উঠল, চলল-ফিরল, নাচল-কুঁদল, কাগজ দিয়ে ট্যাদ্‌রা বানিয়ে ফেলল, আর ব্ল্যাকবোর্ডটা হ'ল জয়ঢাক। মিস হ্যাডনের তদারকিতে থাকবার কথা ছিল বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন না ব'লেই এ-সব হ'তে পারল। তিনি গিয়েছিলেন মারী লুইসের বংশ-পত্রিকা খুঁজে আনতে; ইতিহাসের শিক্ষিকা তাঁকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিলেন সান্ধ্য প্রস্তুতির সময় পত্রিকাটা এনে রাখতে, যাতে মেয়েরা সেই পত্ররাশির মধ্যে বিচরণ করতে পারে, কিন্তু তার মনে ছিল না। 'আমি কোনো কর্মের না,' হাত বাড়িয়ে পত্রিকাটা খুঁজতে-খুঁজতে মিস হ্যাডন ভাবলেন; সেটি অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে চাপা ছিল একটি শঙ্খের তলায়, যেটি অধ্যক্ষা সংগ্রহ করেছিলেন সেণ্ট হেলেনা থেকে। 'আমি বোকা, শ্রান্ত, বুড়িয়ে গেছি, মরতে পারলে বাঁচি।' এই-রকম ভাবতে-ভাবতে তিনি যন্ত্রচালিতের মতো শঙ্খটা তুলে ধরলেন কানের কাছে: ঠিক তাঁর বাবা যেমন ধরতেন ছেলেবেলায়, নাবিক ছিলেন তিনি।.....

সাগরের শব্দ শুনলেন; প্রথমে শুধু তরঙ্গের ফিসফিসানি সমতল কর্দমে কিংবা খটখটানি শিলার সংঘর্ষে, অথবা বালির ওপরে একটি ঢেউয়ের ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ অভিঘাত, অথবা পাহাড়ে-আছড়ানো ঢেউয়ের দীর্ঘায়িত, প্রতিধ্বনিময় গর্জন, অথবা মধ্যসমুদ্রের ধ্বনি, যেখানে জলরাশি পুঞ্জীকৃত হ'য়ে পর্বতপ্রমাণ, আবার চিরে গিয়ে গিরিপথসদৃশ; অথবা যখন কুয়াশা নামে আর সিন্ধু ধীরে ওঠে-পড়ে। অথবা যখন বাতাস এত তাজা যে বড়-বড় ঢেউ আর যে-সব ছোট-ছোট ঢেউ-রা থাকে বড় ঢেউয়ের মধ্যে, সকলেই আনন্দে গান গেয়ে ওঠে আর সাদা ফেনার চুম্বন ছিটিয়ে দেয় একে অন্যের দিকে। সবই শুনলেন তিনি, কিন্তু অবশেষে শুনতে পেলেন সমুদ্রকেই, আর বুঝলেন যে সে চিরদিনের জন্যে তারই র'য়ে গেল।

'মিস হ্যাডন!' অধ্যক্ষা বললেন, 'মিস হ্যাডন! কী ব্যাপার, মেয়েদের তদারক করছেন না যে?'

মিস হ্যাডন কান থেকে শঙ্খটি সরিয়ে ক্রমবর্ধমান দৃঢ়তা নিয়ে তাঁর মনিবের সম্মুখীন হলেন।

'আমরা বাড়ির অন্যদিকটায় রয়েছি, তবুও আমি এলেনের গলা শুনতে পাচ্ছি,' অধ্যক্ষা ব'লে চললেন। 'আমি তো প্রায় ভেবেছিলাম যে এখন বক্তৃতা শেখানোর ঘণ্টা। দয়া ক'রে এখনই কাগজ-চাপাটা নামিয়ে রেখে নিজের কাজে যান, মিস হ্যাডন।'

সংগীত-শিক্ষিকার হাত থেকে তিনি শঙ্খটি নিলেন যথাস্থানে রাখবার জন্যে। কিন্তু অনুকরণের তাগিদে বাধ্য হ'য়ে সেটা তিনি কানে তুললেন। তিনিও শুনতে লাগলেন।

…তিনি শুনলেন একটি বনে পাতার মর্মর। তাঁর পরিচিত কোনো বন নয়, কিন্তু তিনি যত লোককে চিনতেন তারা সকলে সেখানে ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘুরছে আর মৃদুভাবে শিঙে বাজিয়ে পরস্পরকে ডাকছে। তখন রাত্রি, তারা শিকারে বেরিয়েছে। মাঝে-মাঝে খশখশ শব্দে পশুদের আনাগোনা, একবার 'ধর ধর' শব্দে পশ্চাদ্ধাবন, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তাঁর বন্ধুরা নিঃশব্দে ঘোড়া চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে তিনি, তারা চলেছে জঙ্গল ভেদ ক'রে, দিকে-দিকে এবং চিরদিনের জন্য।

এক কানে যখন এই-সব শুনছেন, তখন অন্য কানে মিস হ্যাডন বলছেন : 'আমি আমার কাজে যাচ্ছি না। যখন থেকে এখানে এসেছি, তখন থেকেই আমি কাজে অবহেলা করছি, আর একবার করলে বিশেষ তফাৎ হবে না। আমি সংগীতজ্ঞ নই। আমি ছাত্রীদের ঠকিয়েছি, তাদের অভিভাবকদেরও। আমি সংগীতজ্ঞ নই, টাকা রোজগারের জন্য ওই রকম ভান করেছিলাম। এখন আমার কী হবে জানি না, কিন্তু আর ভান করতে পারছি না। আমি নোটিস দিলাম।'

সংগীত-শিক্ষিকা সংগীতজ্ঞ নন শুনে অধ্যক্ষা বিস্মিত হলেন ; পিয়ানোর বাজনা এতদিন ধ'রে চলছে যে তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন সব ঠিক আছে। অন্য দিন হ'লে তিনি জ্বালা-ধরানো উত্তর দিতেন, কারণ তিনি একজন বিদুষী মহিলা ; কিন্তু এখন মর্মরিত অরণ্য তাঁর মুখে শুধু এই উত্তর জোগাল, 'মিস হ্যাডন, এখন নয় ভাই ; ওটা কাল সকালে ঠিক করা যাবে। ভালো লাগে তো আমার বসবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন ; আমিই দেখছি মেয়েদের। ওদের সঙ্গে থাকাই আমার কাছে বিশ্রামের সামিল।'

কাজেই মিস হ্যাডন শুয়ে পড়লেন এবং তন্দ্রার মধ্যে সাগরের আত্মা তাঁর কাছে ফিরে এল। এবং অধ্যক্ষা মাথাভর্তি বনমর্মর নিয়ে পড়ার ঘরে গেলেন আর আগে তিনবার কেশে নিয়ে তবে দরজা খুললেন। সব মেয়েকে স্বস্থানে পাঠরত দেখা গেল, কেবল ডলরেস্ আর ভায়োলেট বাদে, কিন্তু অধ্যক্ষা তাদের না দেখার ভান করলেন। কিছুক্ষণ পরে মারী লুইসের বংশ-তালিকার খোঁজে গেলেন তিনি, যেটা আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে আবার গেল অশ্বারোহীরা।…

সকালে মিস হ্যাডন বললেন, 'আমি এখনও যেতে চাই, কিন্তু আপনার সঙ্গে একটু পরে কথা বললেই পারতাম। আশ্চর্য একটা খবর পেলাম। অনেকদিন আগে আমার বাবা একটি লোককে জলে ডোবা থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সে লোকটি সম্প্রতি মারা

গেছেন ; আমাকে সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ি দিয়ে গেছেন, সেখানে বাস করার মতো টাকাও রেখে গেছেন। আমাকে আর কাজ করতে হবে না। তাই, যদি আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম তবে অনেক ভদ্র থাকতে পারতাম আপনার কাছে এবং'— একটু লাল হলেন তিনি— 'নিজের কাছে।'

কিন্তু অধ্যক্ষা তাঁর দু-হাত ধ'রে নাড়া দিয়ে তাকে চুম্ খেলেন। 'আপনি অপেক্ষা করেন নি ব'লে আমার আনন্দ হচ্ছে.' তিনি বললেন। 'আপনি কাল যা বলেছেন, তা খুব সত্যি, ঝোপের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট ডাকের মতো। ইচ্ছে করে, আমিও যদি—' তিনি থেমে গেলেন। 'কিন্তু এখনকার মতো কাজ হচ্ছে পুরো একদিন স্কুল ছুটি দেয়া।'

ডাকা হ'ল মেয়েদের, অধ্যক্ষা একটি ভাষণ দিলেন, মিস হ্যাডন দিলেন আর-একটি, তিনি সকলকে তার নতুন বাড়ির ঠিকানা দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে আমন্ত্রণ জানালেন। অতঃপর রোজাকে পাঠানো হ'ল বরফ আনতে কেকওয়ালার কাছে, এনিডকে ফল আনতে ফলওয়ালার কাছে, মিলড্রেডকে লেমনেড আনতে মিষ্টির দোকান থেকে। তারপর সকলে গাড়ি চ'ড়ে অনেকদূরের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অনিয়মের খেলা খেলল। সবাই লুকোল, কেউ চোর হ'ল না, সবাই ব্যাট্ করল, কেউ ফিল্ডিং খাটল না ; কেউ বুঝল না সে কোন দলে, কোনো দিদিমণি দেখিয়ে দিতেও চেষ্টা করলেন না। এমনকি একই সঙ্গে দুটো খেলায় যোগ দেওয়া গেল, একটায় ক্লাম্প্‌স্ হ'য়ে, আর অন্যটায় পিটার প্যান। আর সমন্বয়-পদ্ধতি? সেটার কথা তুলল না কেউ, কিংবা তুললেও তাচ্ছিল্য ক'রে। এলেন তো একটা গানই বেধে ফেলল সেটার বিরুদ্ধে। গানটা এই—

বুড়ো বসি হাঁদা,
চ'ড়ে তার গাধা,
পায়েসের সবটুকু খেলো ;
কিসমিস তুলে
বুড়ো আঙুলে
বলল সে, 'ছেলে আমি ভালো'।

আর ছোট-ছোট মেয়েরা গানটা এক নাগাড়ে গাইল ঘণ্টা তিনেক।

দিনের শেষে অধ্যক্ষা তাঁর এবং মিস হ্যাডনের কাছে পুরো দলটাকে ডাকলেন। কতকগুলো পরিতৃপ্ত, ক্লান্ত মুখ তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালো। সূর্য ডুবে যাচ্ছে, দিনের বেলায় যত ধুলো উড়েছে সব ব'সে যাচ্ছে মাটিতে। হাসতে-হাসতে, অল্প একটু লজ্জার সঙ্গে অধ্যক্ষা বললেন, 'কী মেয়েরা, আমার সমন্বয়-পদ্ধতিকে যে আমল দিচ্ছ না মনে হচ্ছে!'

'দিচ্ছি না-ই তো!' 'কই আর দিলাম।' ইত্যাদি উত্তর দিল মেয়েরা।

'আমাকে একটা স্বীকারোক্তি করতেই হচ্ছে', অধ্যক্ষা ব'লে চললেন, 'আমারও

ভালো লাগে না। সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্রী লাগে। কিন্তু তবু ওটা রাখতেই হ'ল, ও-ধরনের জিনিষ শিক্ষা-পরিষদের খুব পছন্দ কিনা।'

এই শুনে সমস্ত শিক্ষিকারা হেসে উঠলেন, সব মেয়েরা জয়ধ্বনি দিল ; আর ডলরেস্ আর ভায়ালেট ভাবল শিক্ষা-পরিষদ বুঝি একটা নতুন ধরনের খেলা, তারাও হেসে উঠল।

বলাই বাহুল্য, এই কেলেঙ্কারীটি মেফিস্টোফেলিসের নজর এড়ায় নি। সুযোগ পাওয়ামাত্র তিনি স্বর্গীয় ধর্মাধিকরণে চললেন বিরাট একপ্রস্থ পাকানো কাগজ নিয়ে, তার ওপরে লেখা, 'আমি অভিযুক্ত করিতেছি!' অর্ধপথে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল দেবদূত রাফেলের। রাফেল তাঁর চিরাচরিত শিষ্টতার সঙ্গে জানতে চাইলেন তিনি কোনো সহায়তা করতে পারেন কিনা।

'ধন্যবাদ, এবারে আর প্রয়োজন হবে না,' মেফিস্টোফেলিস জবাব দিলেন। 'এবারে একটা সত্যিকারের অভিযোগ আছে আমার।'

'আমাকে একবার দেখালে ভালো হ'ত,' দেবদূত বললেন। মিছিমিছি অতদূর ওড়া খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। একেই তো সেবার জোব-এর ব্যাপারে কী নাকালটাই হ'তে হ'ল।'

'ওঃ, সে তো আলাদা ব্যাপার।'

'তার পরে আবার ফাউস্ট ; যতদূর মনে পড়ে, সেবারেও তো শেষ পর্যন্ত রায় আপনার বিপক্ষে গেল।'

'আরে, সেও তো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। না, এবারে আমি নিশ্চিত। আমি প্রতিভার নিষ্ফলতা প্রমাণ ক'রে দেব। মহাপুরুষরা মনে করেন তাঁরা সকলকে নিজেদের কথা বোঝাতে পারছেন, আসলে তারা পারেন না ; লোকে মনে করে তারা বুঝছে, আসলে তারা বোঝে না।'

'এ-কথা যদি প্রমাণ করতে পারেন, তবে সত্যিই আপনার কেস্ খুব পাকা', রাফেল বললেন। 'কারণ এই ব্রহ্মাণ্ডকে সমন্বয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব'লেই ধরা হয়। প্রত্যেকে স্বীয় ক্ষমতানুযায়ী সমন্বয়সাধন করছে।'

'শুনুন। প্রথম অভিযোগ : বেটোফেন নির্দেশ দিলেন যে কতিপয় স্ত্রীলোক তাঁর "এ মাইনর কোয়ার্টেট্"-এর অনুষ্ঠান শুনবে। তারা শুনতে পেল— কেউ বা গোরার বাদ্যি, কেউ-কেউ বা শাখের শব্দ। দ্বিতীয় অভিযোগ : নেপোলিয়ন নির্দেশ দিলেন যে উপরিউক্ত স্ত্রীলোকেরা অস্টারলিজ-এর বিজয়োৎসবে অংশ নেবে। ফল— একটি উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি এবং তার পরে একটি স্কুলের প্রমোদ। তৃতীয় অভিযোগ : স্ত্রীলোকেরা বেটোফেন বাজাল। বধিরতাবশত, এবং কেরানীদের অসাধুতার জন্য, তিনি মনে করলেন যে বাদকরা অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। চতুর্থ অভিযোগ : শিক্ষা-পরিষদের প্রশংসা কুড়োবার জন্যে স্ত্রীলোকেরা নেপোলিয়ন

পাঠে রত হ'ল। তাঁর বোধ হ'ল যে ওরা তাঁকে ঠিকমতো বুঝেছে। আমার অন্যান্য বক্তব্যও আছে, কিন্তু এগুলোই যথেষ্ট। কেইন কতৃক এবেল-নিধনের দিন থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিভা ও জনসাধারণের মধ্যে কখনও সমন্বয় সাধিত হয় নি।'

রাফেল সহানুভূতির সুরে বললেন, 'এবার শোনা যাক আপনার কেস্-টা।'

'আমার কেস্?' মেফিস্টোফেলিস তোতলালেন, 'বাঃ, এই তো আমার কেস্।'

'হায় রে নির্জ্ঞান শয়তান', রাফেল চীৎকার ক'রে উঠলেন। 'হায় রে সরলমতি নারকী! মর্ত্যে ফিরে গিয়ে আবার পদচারণা কর। কারণ এরা সমন্বয় করেছে, মেফিস্টোফেলিস। এরা সমন্বয়সাধন করেছে সুর ও জয়লাভের মূল উৎসের মাধ্যমে।'

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : তাঁর স্বদেশচিন্তা

অমিয় বসু

জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্ম হয়েছিল; সে-যুগ নবীন জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনের কাল হিসেবে চিহ্নিত। স্বদেশচেতনার উন্মেষ হয়েছিল এর আগে রামমোহনের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে, কিন্তু পরবর্তী দুই দশকে তাকে কিছু সংশয় কিছু সন্দেহ উত্তীর্ণ হ'তে হ'ল। সংশয়ের বহ্নি যাঁরা প্রজ্বলিত করেছিলেন তারাও বঙ্গসন্তান এবং ইংরেজীশিক্ষায় কৃতবিদ্য। নবলব্ধ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে তাঁরা দেশপ্রেমের সংজ্ঞায় নব্যচিন্তা প্রয়োগ করলেন। অবশেষে ১৮৫৭-৫৮ সালের পর ক্রমশ এই দ্বিধার অবসান হ'য়ে এল, একদিকে পাশ্চাত্যমোহ পুঁথিগত দেশপ্রেম থেকে জাতীয় চিন্তা মুক্তিলাভ করল, অপরদিকে অকৃত্রিম ভারতচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সুসমন্বিত দেশপ্রীতির উন্মেষ হ'ল। এই শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে বাংলা দেশে একটি সর্বাত্মক প্রস্তুতি লক্ষ করা যায়। বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই সংস্কারব্রতে নিরত; সাহিত্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ আসন্ন; জাতীয়জীবনের আর দু-জন মহান রূপকার রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সবে আবির্ভূত হয়েছেন। এমন যুগসন্ধিক্ষণে ১৮৬৪ সালে রামেন্দ্রসুন্দর যখন জন্মগ্রহণ করলেন তখন সমগ্র দেশে একটি দৃঢ় উদারনৈতিক আদর্শের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য ও কর্মে এই পটভূমিকার প্রভাব স্মরণীয়। শৈশব থেকে তিনি জাতীয়তাবাদের এক উদার ধারায় লালিত হন যার ফলে তাঁর মধ্যে একটি স্বাধীন চিন্তার বিকাশ লক্ষ করা যায়। একদিকে দেখা যায় তাঁর মন ভারতীয় ঐতিহ্যে সুগঠিত, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যায় শিক্ষিত। জগৎসভায় সম্মানিত আসন-লাভের জন্যই যে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন সে-কথা রামেন্দ্রসুন্দর বারংবার বলেছেন। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অহেতুক কোনো মোহ ছিল না। সে-শিক্ষার চমকপ্রদ অভিনবত্ব জাতিকে বহুকাল ধ'রে বিভ্রান্ত ক'রে এসেছে, প্রগতির নামে তরুণদল দুঃশীলতার চর্চা করেছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের ঘটেছে চরম অবমাননা। ১৯১৭ সালে রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে রামেন্দ্রসুন্দর স্যাডলার কমিশনের কাছে বিবৃতিপ্রসঙ্গে বললেন, 'Western education has given us much; we have been great gainers; but there has been a cost, a cost as regards culture; a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life.'

পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল এ-কথা সত্য। কিন্তু সংস্কৃতি, আত্মসম্মান এবং জীবনের মর্যাদায় গুরুতর ক্ষতি সাধিত হ'ল। শিক্ষাব্রতী রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এর একমাত্র সমাধান ছিল দুই ভাবধারার সম্মিলন, একটি সুষ্ঠু সিনথেসিস। তাঁর জীবনীকার আশুতোষ বাজপেয়ী মন্তব্য করেছেন যে, তিনি 'প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষা হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণীয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধারার সম্মিলন ঘটাইয়া তাহা জাতীয় শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।'[১] সমকালের বহু মনীষীর মতো রামেন্দ্রসুন্দর বিশ্বাস করতেন যে, প্রাচ্যের মহান জীবনাদর্শ এবং প্রতীচ্যের শক্তি-বিজ্ঞান, এই দুয়ের মিলন হ'লে তবেই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, কারণ 'বঙ্কিমচন্দ্ররূপী রাজহংস পাশ্চাত্যনীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন' তা অনন্যসাধারণ, এবং 'তিনি কেবল ক্ষীরসংগ্রহ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার আকর্ষণ ও মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন।'[২]

মনীষীদের বাসনা ছিল প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চার মাধ্যমে দেশবাসীর মনে আত্মমর্যাদা-বোধ জাগ্রত করা। ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শে গৌরববোধ রামমোহনের সময় থেকেই ধীরে-ধীরে কার্যকরী রূপ গ্রহণ করছিল, সঙ্গে-সঙ্গে পুরাবৃত্তচর্চারও প্রসার হ'ল।

---

১ আশুতোষ বাজপেয়ী— 'রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ ২৪২

২ 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'— চরিত-কথা। পৃ ৩৬

রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ প্রত্যেকে ঔপনিষদিক আদর্শে তাঁদের শ্রদ্ধা ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরও সে-উত্তরাধিকার স্বীকার করেছিলেন। নিষ্ঠাবান শাস্ত্রচর্চার ফলে প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার প্রতি তিনি অশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এই উদ্‌যোগের অঙ্গ হিসেবেই তিনি রামমোহন ও রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' অনুবাদ করেন ১৯১১ সালে। প্রাচীন ভারতের ব্যক্তিজীবনে মনুষ্যত্বের যে-বিকাশ হয়েছিল তার প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে 'কর্মকথা' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে।

উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরভাগে ভারতীয় ভাবাদর্শের প্রসারের অন্যতম কারণ এটি পঞ্চাশ বছর আগে ডিরোজিও-যুগের প্রতিভাবনার কাল। হিন্দু কলেজের একদল ছাত্রের মধ্যে ডিরোজিও কু-সংস্কারবর্জিত প্রগতিশীল চিন্তার বীজ রোপণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের চরিত্রগঠনে ভারতীয় মূল্যবোধকে যথেষ্ট মর্যাদা দেন নি। ১৮৩১ সালে ডিরোজিও-র মৃত্যুর সময় থেকে এরই ফলে এই গোষ্ঠীর অনেকের প্রগতিবাদ পরিণত হ'ল তীক্ষ্ণ পুঁথিসর্বস্বতায়। তাছাড়া এ-সম্প্রদায়ের সকলেই যে আচার-আচরণে শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন এমন নয়। সামগ্রিকভাবে, সে-যুগের ইংরেজীশিক্ষিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য-অনুকরণস্পৃহা প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। এই ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চাশ বছর পরে, বহুভাবে। সেদিন 'নব্যবঙ্গ'-গোষ্ঠীরই কয়েকজন প্রধান যেমন জাতীয় আন্দোলনে চিন্তা-নায়করূপে এসেছিলেন, তেমন এসেছিলেন চন্দ্রনাথ বসুর উগ্র 'পৌরাণিক' দল। ইয়ং বেঙ্গলের 'ডাউন উইথ্ হিন্দুইজ্‌মে'র উত্তর দিতে উত্তেজিত উৎসাহে 'Resurrect Old Hinduism' ধ্বনি তুললেন শশধর তর্কচূড়ামণি। রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেমের মূল্য কিন্তু কোনো শ্রেণীর সাময়িক উত্তেজনায় খণ্ডিত নয়। সে-দেশপ্রেমের আদর্শ উদার মর্যাদাসম্পন্ন এবং তার সঙ্গে 'নব্যবঙ্গে'র পার্থক্য মৌলিক। তাঁকে 'ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার' ব'লে সংবর্ধিত করেছেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। এই প্রতিক্রিয়া অন্ধ শাস্ত্রানুসরণে নয়, এই প্রতিক্রিয়া জাতীয় চরিত্রের শৃঙ্খলাসাধনে এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে দেশের মাটির সম্পর্কস্থাপনে।

জাতীয় চরিত্রের উন্নতির জন্যই প্রয়োজন ইতিহাসচেতনা এবং এর পরে দেশপ্রেম স্বাভাবিকভাবে পুঁথিসর্বস্বতা থেকে মুক্ত পাবে, এই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে-জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্বতোভাবে উপহাস্য।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইউরোপের গণ-অভ্যুদয়ের সংজ্ঞা ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় আরোপ করবার চেষ্টা হয়েছিল। একই প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর আরো তীব্র উক্তি করেছেন: 'আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্ধা না করে; আপনার

PRESIDENCY COLLEGE LIBRARY, CALCUTTA.

জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশপ্রিয়তার আস্ফালন না করে।'[৩] তাঁর নিজের দেশপ্রেম ইতিহাসচেতনায় অনুপ্রাণিত।

ইতিহাসচেতনা অথবা ঐতিহ্যচর্চার মাধ্যমে রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশচিন্তা জাতীয় আত্মশক্তির উদ্বোধনে ব্রতী হয়েছে, ইংরেজ-বৈরিতায় পর্যবসিত হয় নি। তাঁর সাহিত্যে, এমন কি বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক রচনাগুলিতেও, ভারতের প্রাচীন গৌরবের অনুধ্যান প্রাধান্য লাভ করেছে। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে, সে-গৌরব ক্ষাত্রযুগের রজোশক্তিতে তত নয়, যত সনাতন বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শে। ভারতবর্ষের প্রকৃত শক্তি শস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রে এবং ঐশ্বর্যের চেয়ে ধর্মে বেশি। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' আলোচনায় শুধু যে এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, সেই ধর্মকে দেশ ও কালাতীত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারও করা হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির এমন বিশালতার ফলে রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেম সকল সংকীর্ণতা সকল অনুদারতার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত রয়েছে। যে-শাশ্বত ধর্মাদর্শ চিরদিন ভারতাত্মার মহিমা প্রচার ক'রে এসেছে, ভবিষ্যৎ-ভারতের সেইটিই মহত্তম উত্তরাধিকার, যার কাছে জয়-পরাজয়ের প্রশ্নও যেন অকিঞ্চিৎকর। 'ধর্মের জয়' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন— 'প্রাণিসমাজ ব্যাপ্ত করিয়া নিয়তির বশে যে ঘোর নির্দয় নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম চলিতেছে, সেই জীবনসংগ্রামে এখন আমাদের পরাজয়।...আমরা জয়ের আশা করিব না— ভারতবাসীর ভবিতব্য কি— সেই দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া আমাদের কাজ নাই। ... ...জয় পরাজয় লক্ষ্য না করিয়া আমরা ধর্মের পথে চলিব। ধর্ম আমাদের লক্ষ্য হউক। সত্য আমাদের লক্ষ্য হউক।'[৪] তৎকালীন জাতীয় পটভূমিকায় সেই আদর্শকে সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের বিনিময়েও বহন করা দেশবাসীর পবিত্র কর্তব্য। 'যজ্ঞ' প্রবন্ধে লেখকের অভিমত: 'যে সনাতন ধর্ম সহস্র বিপ্লবে এই পুরাতন সমাজকে ধারণ করিয়া আসিতেছে এবং বহু অনার্য আক্রমণ সত্ত্বেও এই আর্যসমাজের বিশুদ্ধি ও বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াছে, সেই বাণী, সেই শব্দ, সেই ধর্ম আমাদের এই বিপত্তির দিনে পথপ্রদর্শক হউন। স্বধর্মে রক্ষিত হইলেই আমরা রক্ষিত হইব ইহাই এই ক্ষুদ্র লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস।'[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি স্মরণীয় ঘটনা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রচেষ্টায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'-এর পূর্ণ রূপায়ণ। বাংলা দেশে প্রজ্ঞানের অনুশীলনে, অথবা বৃহত্তর অর্থে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণে, এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এখন সুবিদিত। এর অন্যতম পরিচালক কেবলমাত্র সৎসাহিত্যের প্রসারকল্পে এই পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ হন নি, স্বদেশ-সম্পর্কে তাঁর ধ্যানগুলি এই উদ্যোগে কর্মে রূপায়িত হয়েছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন্তব্য 'দেশাত্ম-

---

৩ 'চরিত-কথা' পৃ ৭৫

৪ রামেন্দ্র-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, পৃ ১৫৭

৫ রামেন্দ্র-রচনাবলী। ২য় খণ্ড, পৃ ১৭৬

বোধের সাধনার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়াছিলেন' প্রাণধেয়। পরিষদের ১৩১৫ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণীতে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, 'জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন এবং দেশমধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন।' এই বিবরণীর অন্যত্র একটি চমকপ্রদ উক্তি আছে, 'বাঙ্‌লা সাহিত্য বর্তমান কালে বাঙালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত জাতির যদি উদ্ধারসাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, এ কথা ধ্রুব সত্য।' স্পষ্টতই রামেন্দ্রসুন্দরের ধারণা ছিল স্বদেশের সংকটকালে কেবলমাত্র আনন্দদান ছাড়াও সাহিত্যিকদের গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে, এবং সাহিত্য-পরিষৎ সে-ব্রতে তাঁদের প্রেরণা জোগাবে। মাতৃভাষা-চর্চার মাধ্যমে ঐক্যসাধনের মন্ত্রে তিনিও উৎসাহিত হয়েছিলেন।

সমকালীন স্বদেশচিন্তায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব প্রত্যক্ষ নয়, সে-কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর একমাত্র কারণ তিনি দেশসেবার জন্য রাজনীতির সহজ মার্গ বেছে নেন নি, তাঁর ক্ষেত্র ছিল বিভিন্ন। জাতীয় দেশাত্মবোধের পরিচালনায় কখনও তাঁকে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় না। একটি ব্যতিক্রম ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ-নিরোধ আন্দোলন, যে-সময়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সক্রিয় সহযোগিতা আন্দোলনের পক্ষে প্রভূত শক্তিসঞ্চয় করে। জাতির জন্য তাঁর 'অরন্ধন' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাখীবন্ধন' দুটি পরিকল্পনাই নিখিল বঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়।

স্বদেশকে জননী সম্বোধন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাতে প্রথম পাওয়া যায়, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রায় পূজার স্তরে গিয়ে পৌঁছোছল। রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশভাবনাকে এই ধারার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। তাঁর স্বাদেশিকতা তো কেবল উপকারের বাসনা নয়, শুধু কর্ঠোর কর্তব্যপালন নয়, সে যেন মাতৃসেবার মতো স্বতঃস্ফূর্ত। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাশিম-বাজারের বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে তাঁর অভিভাষণে এই সেবা-ব্রত পরিস্ফুট। তিনি ঘোষণা করলেন, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্যামাঙ্গিণী জননীকে যে মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্মের অনুকূল মূর্তি।' সাহিত্যগুরু বঙ্কিম যে-লক্ষ্যের সন্ধান দিয়েছেন, বাংলার সাহিত্যিকদের সেই স্বর্গে জাগরিত হবার আহ্বান জানালেন রামেন্দ্রসুন্দর, 'যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।' তাঁর স্বদেশচিন্তার প্রকাশ হিসেবে সাহিত্য-সম্মিলনের ভাষণগুলি বিশেষভাবে প্রাণধেয়। ১৩২০ সালের ভাষণে মাতৃস্নেহকাতর দেশপ্রেমের সজল রূপটি প্রকাশ পেয়েছে : 'পৃথিবীর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অধঃশয্যায় শয়ানা আমার প্রাচীনা জননী ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া, গৌরবের মুকুট পরিয়া জগতের সম্মুখে পুনরায় দণ্ডায়মানা হইবেন, এই আশা অন্তিমদিনে আমার বলাধান করিবে।'— দেশপ্রেম রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে একটি আহাড়িয়া-মাত্র নয়, সে

একটি "passion," একটি মহৎ হৃদয়াবেগ। অথচ এই হৃদয়াবেগকে উচ্ছ্বাস মনে করা ভুল, তা যুক্তিনির্ভর দেশচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্যের পরিশীলিত মাধ্যমের সাহায্যে রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেম নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃত দেশপ্রেমের মূল্য কালাতীত হ'লেও, একটি বিশেষ কালকে কেন্দ্র ক'রেই তা উৎসারিত হয়। ১৯০৫ সালের আন্দোলন উপলক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরের যে-রচনা প্রকাশিত, সেটি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা', ঐতিহাসিক সম্মানলাভের যোগ্য। বাংলার ঘর এবং বাংলার মাটির প্রতি একটি স্পর্শকাতর মমতা রচনায় পরিব্যাপ্ত : 'মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চূড় পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরেব লক্ষ্মী ঘরে থাকুন ; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।'

রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেমের পিছনে এই গভীর মমত্ববোধ ছিল এবং দেশাত্মার সম্যক উপলব্ধি ছিল, তাই দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর আসন পরম প্রীতির ; জাতীয় আন্দোলনে পুরোধা না হ'য়েও স্বমর্যাদায় তিনি শ্রদ্ধেয়।

বের্টোল্ট ব্রেখট : কবি ও নাট্যকার

জিষ্ণু দে

বের্টোল্ট ব্রেখট (জন্ম ১৮৯৮, ১০ই ফেব্রুয়ারী— মৃত্যু ১৪ই অগস্ট ১৯৫৬) এখনও সারা পৃথিবীতে বিরাট কবি ও নাট্যস্রষ্টা হিসেবে পরিচিত। তাঁর স্বদেশ জর্মনীর বাইরে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি বোধহয় আমেরিকাতে— যদিও তিনি ছিলেন বামপন্থী ও জর্মন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।

যেমন বিদেশে, তেমনি এখানে তাঁর নাট্যসৃষ্টির কথাটাই সমধিক প্রচারিত, যদিচ তাঁর নাটকের অভিনয়দর্শন অথবা তাঁর নাট্যপদ্ধতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া তাঁর নাট্য-সৃষ্টির পরিচয় অসম্ভব। তাঁর নাট্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পরিচয় যদিও তাঁর স্বলিখিত নাটকেই, তবু এ-সব নাটকের উপযুক্ত অভিনয়দর্শন বিনা এদের সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে না— কারণ নাটকমাত্রই শ্রাব্যও বটে, দৃশ্যও বটে। যেহেতু অডেন-এর মতো কবি ও এরিক বেন্টলি, ক্রিস্টোফার

ইশারউড-এর মতো নাট্যবিদ্‌গণ ব্রেখটের নাটক অনুবাদে সদাই উৎসাহী সেহেতু অনেক সময় অনুবাদসত্ত্বেও ব্রেখটের কবিত্ব তাঁর কবিতা, গল্প ও নাটকে অটুট থাকে এবং কবি হিসেবে ব্রেখটকে চেনা অনেকটা সোজা।

ব্রেখট প্রায় চল্লিশটি ছোট-বড় নাটক লিখেছেন। বিষয় ও পরিণতির বিচারে তাঁর নাট্যজীবনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে অহমস্মিবাদী বা এক্সিস্টেনশিআলিস্ট নাটক— বিষয়: অকারণ লড়াই, সাইকেল রেস, খুন-রাহাজানি, বেশ্যাবৃত্তি ও ধর্ষণ। ইওরোপের তদানীন্তন অনেক শিল্পী এই উৎকট উপজীব্য নিয়ে মেতেছিলেন এবং আজও তা ছাড়তে পারেননি। ব্রেখটের পক্ষে কিন্তু এ-জগৎ এক ক্ষণস্থায়ী উদ্দীপনার চেয়ে বেশী কিছু হয়নি; এ-নরকের সমূহ উপলব্ধি নিয়ে তিনি তাঁর মধ্যম পর্যায়ের নাট্যাবলীতে চ'লে যান। এই দুই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে তাঁর সংগীতপ্রধান নাটকগুলি, যাতে সংগীতের সঙ্গে-সঙ্গে বিষয়বস্তু সমান মূল্য পায়। এই সময় জর্মনীতে পল হিণ্ডেমিথ, কুর্ট ভাইল ইত্যাদিরা অপেরা-কে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্মানযোগ্য ক'রে তোলার জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টা 'বাডেন-বাডেন মুভমেণ্ট' নামে পরিচিত। ব্রেখট ও ভাইল এইসময় পরপর কয়েকটি নাটক-অপেরা লেখেন যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত 'থ্রি পেনি অপেরা'। এই সময় থেকেই ব্রেখট সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, যদিচ 'থ্রি পেনি অপেরা' অংশত প্রথম পর্যায়ের মতোই স্বপ্নবিলাসী নাটক। কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যে এটা দেখানো যায়:

...John's gone west and James is dead
And George is missing and barmy.
Blood, however, is still blood-red
They're recruiting again for the army.

কিংবা

Voice off : What does a man live by ?
Macheath : What does a man live by ? By resolutely
lll treating, beating, cheating eating some other bloke !
A man can only live by absolutely
Forgetting he's a man like other folk !
Chorus off : So, gentlemen, do not be taken in
Men live exclusively by mortal sin.

কিংবা Song of Solomon-এর কথাও বলা যায় যার প্রথম ব্যবহার 'থ্রি পেনি অপেরা'-য় ও শেষ ব্যবহার পরিণত বয়সের নাটক বিখ্যাত 'মাদার কারেজ ও তাঁর সন্তান-সন্ততি'-তে। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে ব্রেখট তাঁর বিখ্যাত নাট্যপদ্ধতির অবতারণা করেন। Arthur Waley-অনূদিত জাপানী নাটক, চীনের বিখ্যাত অভিনেতা Mei Lan

Fang ও জর্মনীর এর্ভিন পিস্কাতোরের দলের অভিনয়পদ্ধতিতে এবং অপেরা মুভমেণ্ট-এ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রেখট তাঁর এই নাট্যপদ্ধতির অবতারণা করেন। এ-পদ্ধতির উদ্দেশ্য কখনোই দর্শককে বিভ্রান্ত না করা— সব সময় তাকে মনে রাখতে দেয়া যে, সে জীবন নয়, জীবন্ত নাটক দেখছে। এতে তার চিন্তাশক্তিকে এমনভাবে সজাগ রাখা চলে যে, সে নাটকের প্রতিটি ঘটনার যৌক্তিকতা বিচার করতে ব'সে আবেগাপ্লুত ও মোহগ্রস্ত না হয়। তাই কেউ যদি ভাবেন চমক লাগানোই এই পদ্ধতির মূল কথা তাহ'লে তিনি ভুল করবেন। পিস্কাতোরের মতো ব্রেখটও অনেক সময় প্রোজেক্টারের সাহায্য নিয়েছেন এবং আলোক, সংগীত ও স্টেজসেট বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল দর্শককে চারপাশের জীবনই মঞ্চে তুলে ধ'রে দেখানো— শুধু এক নতুন দৃষ্টকোণ থেকে— যাতে সে এই অপরিচিতির ছদ্মবেশে তার পরিচিত জীবনের ঘটনাকেই প্রশ্ন করে। ব্রেখটের শ্রেষ্ঠ নাটক 'লেবেন দেজ গ্যালিলি' বা গ্যালিলিও-র জীবন (১৯৬৭-৩৯) -এ এবং তাঁর একমাত্র দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা 'ক্লাইনে অর্গানাম ফিউএর ডাস্ থিএটার' (১৯৪৯) -এ তিনি বলেছেন যে আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি এবং প্রশ্ন করাই আমাদের জীবনের মূল ধর্ম। এই ক্রিটিকাল মন ও জিজ্ঞাসাই ব্রেখটের নাট্যতত্ত্বের মূল কথা। বিজ্ঞানে অভ্যস্ত মানুষকে মোহগ্রস্ত করা নাটকের ধর্ম নয়। But science and art meet on this ground, that both are there to make men's life easier, the one setting out to maintain, the other to entertain us. In the age to come art will create entertainment from that new productivity which can so greatly improve our maintenance and in it-self, if only it is left unshackled, may prove to be the greatest pleasure of them all,

এ-দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ। নদী দেখলে কর্তব্য নদীকে বাঁধা, ফলগাছ দেখলে তাতে জল দেয়া, সমাজ দেখলে কর্তব্য অসম্পূর্ণ সমাজকে ডল্টো ক'রে সাজানো। এই সমাজের ছবিটাই নদীর ধারের লোক, ফলগাছের চাষী ও সমাজ ঢেলে-সাজানোর লোকদের স-প্রশ্ন চাহনির সামনে তুলে ধরাটাই নাটকের কর্তব্য।

এই জন্যই একটি অতিবলিষ্ঠ বা অতিদুর্বল চরিত্রকে অনবদ্য অভিনয়ে তুলে ধরা আধুনিক নাটকের কর্তব্য নয়। চমক লাগাবার জন্য ঘটনাসমাবেশ, আলোকসম্পাত ও সংগীত তাই ব্রেখট ব্যবহার করেননি— যদিও এই তিনেরই সুপ্রচুর ব্যবহার মিলবে তার নাটকে। আসলে চমক লাগানোর তিনি এতই বিরোধী ছিলেন যে দৃশ্যের আগে সে-দৃশ্যের ঘটনাবলী লিখিত আকারে ব্রেখট দর্শকদের জানিয়ে দিতেন। উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তকে শ্লথ ক'রে দিতেন গানে, গ্রীক কোরাস বা বাংলা যাত্রার 'বিবেকে'র বক্তৃতায়।

অনেকে মনে করেন ব্রেখট অ্যারিস্টটল বা স্তানিশ্লাভস্কির ডল্টো কথা বলেন— নাটকের

চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের একাত্মতা চান না। আসলে যে-ধরনের একাত্মতায় পক্ষপাত অবশ্যম্ভাবী সেটাই ব্রেখট মনে করেন ত্যাজ্য। নতুবা আভনাত চারত্র ও অভিনেতার সঙ্গে একাত্মতা-বোধে নাটক যে আনন্দদায়ক হয়, তা ব্রেখট বারবার বলেছেন :

The theatre setup's broadest function was to give pleasure. Here is the noblest function we have found for the theatre. ...And the catharsis of which Aristotle writes— cleansing by fear and pity, or from fear and pity— is a purification which is performed not only in a pleasurable way, but precisely for the purpose of pleasure. To ask or to accept more of the theatre is to set one's mark too low.

ব্রেখটের বক্তব্য সবচেয়ে পরিষ্কার হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'গ্যালিলিও'-র বিশ্লেষণে। তাই অর্গানামেও তিনি এই নাটকের কথা বলেছেন।

এই নাটকের প্রথম দৃশ্যেই গ্যালিলিও এক অন্যের তৈরী যন্ত্র পাড়ুয়ার কর্তাদের দেখান— টেলিস্কোপ। দৃশ্যের আগে ব্রেখট সারমর্ম বলছেন :

No one's virtue is complete
Great Galileo likes to eat,
You will not resent, we hope,
The truth about his telescope.

তারপর আমরা শুনি গ্যালিলিও তাঁর বন্ধুকে দেখাচ্ছেন টেলিস্কোপের প্রথম বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। এরপর দৃশ্যে-দৃশ্যে নাটক এগিয়ে চলে :

January ten, sixteen ten
Galileo Galilei abolished heaven.

গীর্জার বিজ্ঞানী ক্লাভিয়াস বলে গ্যালিলিও ঠিক :

Things take indeed a wondrous turn
When learned men stoop to learn
Clavius, we are pleased to say
Upheld Galileo Galilei.

তারপর

When Galileo was in Rome
A cardinal asked him to his home
He wined and dined him as his guest
And only made one small request.

তারপর আটবছরের নীরবতা :

Eight long years with tongue in cheek
Of what he knew he did not speak

Then temptation grew too great
And Galileo challenged fate.

গ্যালিলিও বললেন সূর্যের চারদিকে ঘোরে পৃথিবী।

On April Fool's Day, 'thirty two
Of science there was much ado,
People had learned from Galilei
They used his teaching in their way.

সে-সময়ে বিজ্ঞান ও সমাজ ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যাতে গ্যালিলিও-র চ্যালেঞ্জে ইটালীর মাঠে-ঘাটে ঘরে-ঘরে বিদ্রোহের ডাক ওঠে—

The depths are hot, the heights are chill
The streets are loud, the court is still.

গ্যালিলিও-র ওপর চাপ দেওয়া হয়। এই লেখার পাঠকবর্গ হয়তো জানেন যে গ্যালিলিও কোনোদিন সত্যিই 'uppur si muove' বা 'still if moves' বলেন নি। এটা একটা গল্পমাত্র। ব্রেখটের বক্তব্য : গ্যালিলিও যদি হার না মানতেন তবে সেদিন তাঁর জয় ছিল অনিবার্য—

June Twenty-second, Sixteen thirty three
A momentous date for you and me
Of all the days that was the one
An age of reason could have begun.

গ্যালিলিও আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা ঠিকই। চার্চের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করার পরও এ-সম্মান তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু ব্রেখট বলেন : আজকে বিজ্ঞান ও সমাজের কল্যাণ আর এক নেই। অর্থনৈতিক ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা যে বিজ্ঞানের চেয়ে বেশী তাতে সন্দেহ নেই যখন চার্লস লটন ও বের্টোল্ট ব্রেখট আমেরিকায় 'গ্যালিলিও'-র প্রথম উদ্বোধনীর আয়োজনে ব্যাপৃত তখন অর্থনৈতিক রক্তলিপ্সুদের নিষ্ঠুর হিংসার কাছে বিজ্ঞানের চরম পরাজয় স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে হিরোশিমায়। এর জন্য ব্রেখট দায়ী করছেন গ্যালিলিও ও তাঁর যুগকে।

The 'atomic' age made its debut at Hiroshima in the middle of our work. Overnight the biography of the founder of the new system of physics read differently. The infernal effect of the Great Bomb placed the conflict between Galileo and the authorities of his day in a new, and a sharper light. We had to make only a few alterations,— not single one to the structure of the play. Already in the original version the church was portrayed as a secular authority,

its ideology as, fundamentally interchangeable with many others. From the first the key-stone of the Gigantic figure of Galileo was his conception of a Science for the people.....

তাই ব্রেখটের গ্যালিলিও পুরো মানুষ-এপিক চারিত্র। তার প্রশংসাও করা যায় না, তার নিন্দাও করা যায় না।

শেষে তাই তিনি বলছেন -

May you now guard Science's light.
Kindle it and use it right
Lest it be aflame to fall
Downward to consume us all.

ব্রেখট তাঁর নাটক 'গ্যালিলিও'-র সম্বন্ধে বলছেন :

Strictly speaking, 'The Life of Galileo' can, without much adjustment of the contemporary theatrical style, be presented as a piece of historical 'ham' with a star part. A conventional production (which, however, need never consciously strike the performers as conventional, particularly if it contains some original ideas) must nevertheless, perceptibly weaken the real power of the play, without providing the audience with 'easier access'.

The answer, 'That won't work here' is familiar to the author : he heard it at home, too. Most producers treat plays like this, as a coachman would a motor car when it was first invented. On the arrival of the machine mistrusting the practical instructions accompanying it, this coachman would have harnessed horses in front— more horses of course than to a carriage since the new car was heavier,— and then, his attention being drawn to the engine, he too would have said : 'That won't work here....'

ব্রেখট আরো বলছেন যে 'গ্যালিলিও' অভিনয়ে (১) স্টেজ সেট দেখে রোমের ভাটিকান ব'লে মনে হবে না, মনে থাকবে যে থিএটার থিএটারই। (২) চরিত্রগুলোর চলাফেরা ঐতিহাসিক ছবির মতো হবে— যা অনৈতিহাসিক নাটকেও হওয়া উচিত। পরিচালক 'In the light of a traveller's reports, Galileo constructs his first telescope' এই জাতীয় লেখা দৃশ্যের মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন। (৩) সব চলাফেরাই কিন্তু হবে স্বাভাবিক। চার্চের লোকেদের হাস্যাস্পদ ক'রে তোলা মারাত্মক কারণ, তা নাটকের ধর্মের বিরোধী, যেহেতু চার্চ এখানে ক্ষমতাধর কর্তৃত্বের প্রতীকমাত্র। (৪) গ্যালিলিও-র চরিত্র এ-রকম না হয় যে দর্শক গ্যালিলিও-র চরিত্রবিচারের ক্ষমতা

হারিয়ে ফেলে। আবেগসিক্ত একাত্মীকরণের চেয়ে আরো বিচার-মূলক ও সমালোচনা-মূলক প্রশংসা অনেক কাম্য।

He should be presented as a phenomenon, rather like Richard III, acceptance is gained through alien manifestation.

এই-ই ব্রেখটের আদর্শ এবং আমার মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিষয়ে যে প্রখর চেতনার পরিচয় ব্রেখট তাঁর এই নাটকটিতে দিয়েছেন তা তাঁর এই আদর্শের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যেখানে বিজ্ঞান ও শিল্প মেলে, সেখানেই ব্রেখটের যাত্রাপথ।

স্বদেশচিন্তা : বাংলা সাহিত্যে

পিনাকী গুপ্তভায়া

প্রেম, বিশেষ ক'রে যে-জিনিস নিজের তার প্রতি প্রেম, সহজাত। তাই স্বদেশপ্রেম জন্মগত অনুভূতি। কিন্তু ঠিক যেমন বুদ্ধি ও চিন্তা মানুষের জন্মগত হওয়া সত্ত্বেও তাকে চর্চা দ্বারা বাড়িয়ে তুলতে হয়, তেমনি স্বদেশপ্রেমও সাধনালভ্য। তাকে চিন্তা ও অনুভূতি এই দুই দিয়ে গ'ড়ে তুলতে হয়, জীবন্ত করতে হয়।

যুগে-যুগে মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে বেগবান ও স্বাস্থশাল করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা অনন্য। তাই স্বদেশপ্রেম ও সাহিত্যের যোগ আন্তরিক।

এ-কথার প্রমাণ দেয়া বাহুল্য। স্বদেশী যুগেই আমরা দেখেছি শুধু এক বন্দেমাতরম গানটিই সমস্ত দেশকে জাগিয়েছিল ; মানুষমাত্রেই, সে যত বীর, যত দেশপ্রেমিকই হ'ক না কেন,— অবলম্বন চায়, প্রেরণা চায়। তাই স্বদেশীযুগে মিছিলের প্রতিটি সদস্যের মুখে থাকত বন্দেমাতরম; পুলিশের লাঠির আঘাতে মূর্ছিত দেশকর্মীও নির্ভীক কণ্ঠে বলত বন্দেমাতরম।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সাহিত্য ও স্বদেশপ্রেমের যোগাযোগের এই কথাটি বোধ হয় একটু বিশেষ ক'রে খাটে, কেননা আমাদের মনটাই যেন সাহিত্যের সুরে বাধা। তাই তো স্বদেশী আন্দোলনে দীপ্ত হ'য়ে জ্বলেছিল এক স্নিগ্ধ অথচ দুর্জয় সুষমা। আন্দোলন যেন বৃক্ষ, সাহিত্য-ভূমির রস আকর্ষণ ক'রেই তার সাবলীল ঊর্ধ্বগতি ; তাই সে-যুগের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তিটাকে খেয়ালের বশে চায় নি, মন দিয়েই চেয়েছিল। আন্দোলন তাকে উত্তেজিত

করেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী করেছিল উদ্বুদ্ধ; বস্তুত উত্তেজনা সম্পূর্ণ সাময়িক, উদ্বোধন স্থায়ী। তার ফল সুদূরপ্রসারী।

অত্যন্ত স্বাভাবিক মানবিক কারণেই স্বদেশচেতনার প্রথম উন্মেষ আমাদের দেশেও ঘটেছিল পরদেশী আক্রমণের ফলস্বরূপ। কেন-না যে দেশটায় আমরা বাস করি সে দেশটা যে বিশেষভাবে আমাদেরই সেটা অনুভব করা খুব সহজ নয়। দৈনন্দিন ঘটনা অনুভূতির সঙ্গে এমন ক'রে মিলে যায় যে তাকে হঠাৎ-ক'রে বোঝা যায় না; বাইরের আঘাত প্রয়োজন।

স্বদেশচেতনার উন্মেষের মূলে আর-একটি জিনিস অলক্ষ্যে কাজ করেছে; তা হ'ল সম্রাটদের সাম্রাজ্যবোধ। মৌর্যযুগে যখন বিরাট এক ভূখণ্ড এক নৃপতির অধীনে এল, তখন সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের জন্যই তাঁরা বিশাল ভারতভূমির ভৌগোলিক পরিচয় সংগ্রহ এবং প্রচার করলেন। এক অংশের মানুষ আর অংশের পরিচয় জানল; তাদের বোঝানো হ'ল তোমরা সবাই মিলে একটি গোষ্ঠী—একটি দেশ। এই এলাকার মধ্যে বাইরের লোক এলে তাকে সবাই মিলে বাধা দেবে, তোমার নিজের বাড়িতে দস্যু এলে যা কর। দেশের উপর এইভাবে সাধারণের অধিকার-বোধ জন্মানো হ'ল। এরই পরিণত রূপ স্বদেশচিন্তা।

এই ধরনের যে স্বদেশপ্রেম, তা নিতান্তই সাদামাটা জিনিস। একে ঠিক স্বদেশচিন্তা বলা চলতে পারে না। আসলে স্বদেশচেতনা যখন দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও সেই স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষার ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হয়, তখনই হয় সেটা যথার্থ স্বদেশচিন্তা। এর কারণ স্পষ্ট। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সংহতিবোধটি যদিও চিরকালই প্রখর ছিল, তবু তা পুরোপুরি হৃদয়গত হওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক পার্থক্যের কথা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমাদের ঐক্য যুগব্যাপী চিন্তা ও পরিশ্রম দিয়ে গড়া। সে-বন্ধন নিবিড়। তাই ইতিহাসবোধ যতদিন-না দৃঢ় হ'ল, ততদিন আমাদের স্বদেশচিন্তা দৃঢ় ভিত্তি পেল না। বৈদেশিক আক্রমণের আঘাতে-আঘাতে তা একটা নির্দিষ্টরূপ পেতে লাগল বটে; কিন্তু তাতে গতি ও প্রাণ ঠিক সঞ্চারিত হ'তে পারল না যতদিন-না পাশ্চম তার দ্বার খুলে দাঁড়াল।

এ-কথা যেন কেউ মনে না করেন, ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে অমর্যাদা করা হচ্ছে। আসলে সাংস্কৃতিক ঐক্যের স্পষ্ট ভৌগোলিক ভিত্তিতেই। ভাষা ও চিন্তার সমতা ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই ভৌগোলিক অখণ্ডতা প্রাথমিক প্রয়োজন: অনেকটা প্রাথমিক শিক্ষার মত।

এ-কথা নিশ্চয়ই সত্য নয় যে, ঐতিহাসিক সংহতির রূপটা ইংরেজ-পূর্বকালে অভাবিত ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের বা কালিদাসের স্বদেশচিন্তা বিস্মৃত হওয়া কৃতঘ্নতারই নামান্তর। কিন্তু তুর্কি আক্রমণ বহুদিনের এই ভারত-চেতনার ধারায় প্রথম বিচ্ছেদ

আনল। ঐতিহাসিক নানা কারণে ইংরেজদের আগমনের আগে তার নবীকরণ বা পুনরুন্মেষ ঘটতে পারে নি।

ইংরেজদের সব জিনিসেই একটা বেগ আছে। স্বদেশচিন্তাতেও তাই। আমাদের চিন্তাও তাদের চিন্তার তরঙ্গাভিঘাতে চঞ্চল হ'ল। আমরা কর্মী হলাম।

আমাদের আলোচনার প্রথমেই এসে পড়েন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশহিতৈষীগণ। ওঁদের সব কাজই এই দেশ-হিতৈষণার অঙ্গ : সাহিত্যচর্চাও। এঁরা সাহিত্যে যে-স্বদেশপ্রেমের ধারা বহালেন তার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন সাময়িক স্বদেশপ্রেমের বন্যার পার্থক্যটা এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল নূতন ভাবতরঙ্গকে আমাদের শিরায়-শিরায় অনুপ্রবিষ্ট করানো। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে মুখ্য করার সময় বা সুযোগ তাঁদের হয় নি। তাঁরা পরবর্তীকালের মহাজাগরণের জন্য দেশকে প্রস্তুত করেছিলেন।

সেকালের 'Great Sentinel' রামমোহন। রামমোহনের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা ; প্রতীচ্যের চিন্তা-তরঙ্গকে আত্মস্থাৎ করবার উদারতা। ইংরাজদের স্বাজাত্যবোধকে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং তার বলেই ইংরেজের অবিচারের বিরুদ্ধে দাড়াতে পেরেছিলেন। প্রতীচ্যের সার-বস্তুকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, অন্ধ প্রতীচ্যানুরাগ তাঁর ছিল না। সত্যকারের মোহমুক্ত দেশানুরাগ তার ছিল ব'লেই আমাদের স্বদেশপ্রেমের প্রথম শুরু তার হাতে। স্বদেশপ্রেমের এই বজ্রভেরী বহু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার ধ্বনিত হয়েছে রামমোহনের রচনাবলীতে ও বক্তৃতায়।

রামমোহনের সাধনার উত্তরসূরী তত্ত্ববোধিনী-গোষ্ঠী দেশপ্রেমমূলক সাহিত্যের রচনায় সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এর প্রধান কারণ ইংরাজদের স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষিত সমাজ তাদের দ্বারা আমাদের আরো উন্নাত সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে পড়ল। তাই চলল স্বদেশের ইতিহাস ধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ও অনুসন্ধান।

'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা', 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও পরে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সভ্যরা এই সকল বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখলেন। শাস্ত্রাদির অনুবাদ হ'ল। সচেতনভাবে বাংলাভাষার চর্চা চলল। এই আন্দোলনে সাময়িকপত্রের, বিশেষ ক'রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূমিকা অবিস্মরণীয়, এই আন্দোলনেরই পাশাপাশি সমাজসংস্কারের চেষ্টা, ধর্মরক্ষার চেষ্টা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ দেশপ্রেমমূলক কাজের কথা স্মরণে রাখলে সে-যুগের চিন্তাধারার পূর্ণ রূপটি ধরা যাবে।

এই হ'ল স্বদেশানুরাগের সূত্রপাত। এই গঙ্গোত্রীই পরবর্তী কালকে সজল শ্যামল ক'রে তুলেছে।

আমাদের সাহিত্যে স্বদেশানুরাগের ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধানের স্থান এ নয়। আমরা মূলত দু'টি ধারার চিন্তার কথা বলব। একটি বঙ্কিমের, অন্যটি রবীন্দ্রনাথের।

হিন্দুমেলার প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার উন্মেষ। তাঁর স্বদেশচিন্তা সম্বন্ধে বড় কথা এই যে, তিনি তাঁর সত্যচিন্তা ও সত্যানুরাগের অঙ্গ হিসেবেই দেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর একটি জিনিস যা অত্যন্ত মূল্যবান, তা তাঁর গানের সুর। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রথম পেলাম সেই জিনিস যাকে দেশের কাছে আত্মনিবেদন বলা চলে : 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। অনেকটা ভগবানের কাছে যেমন আমাদের আত্মনিবেদন, সেইরকম। কিন্তু বীর্যের গৌরবকে তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নি : 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে…'। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক স্বদেশচিন্তার পরিপূরকরূপে তাঁর কর্মময় শ্রীনিকেতনকেও প্রত্যক্ষ করতে হবে। তবেই তাঁর স্বদেশচিন্তা সম্পর্কে পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাবে।

বঙ্কিমের স্বদেশচিন্তা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। বঙ্কিম দর্শনে সুপণ্ডিত; তাঁর পথ যুক্তি : তিনি ইতিহাসতাড়িত বাঙালি জাতির সম্মুখে একটি সবল সুস্থ জীবনবাদী আদর্শ স্থাপন কবতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন চিন্তার মুক্তি। রাজনৈতিক পরাধীনতার থেকেও যা তাঁকে বেশী পীড়িত কবেছিল তা চিন্তার পরাধীনতা।

আমাদের সাহিত্যে স্বদেশচিন্তার ধারাটি লক্ষণীয়ভাবে আবেগের পথ ধরল। হয়তো সেই কারণেই যথাযথ পরিণতির পবেহ আমরা স্বাধীনতা পেলাম।

আমাদের সেই সচেতনতা যে কত ক্ষীণ হ'য়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ স্বাধীনতার উল্লাস আমাদের সাহিত্যে ছাপ রাখল না। তাই বোধ করি, ইতিহাসের নিয়মেই, আমাদের আবার বিপর্যয় হ'ল। আমাদেরকে আবার সক্রিয় ও সচেতন ক'রে তুলতে, চিন্তার এই জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে, বোধ হয় আরও এক-একজন রামমোহন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্যই আমাদের বাঁচবার পথ।

হিসাব-নিকাশ

আঁতোয়ান দ্য সাঁতেকজুপেরি

অনুবাদ : বাদল মুখোপাধ্যায়

তখন শেয়ালের সঙ্গে দেখা হ'ল।

শেয়াল বলল 'এই যে, সুপ্রভাত'।

'নমস্কার, সুপ্রভাত', খুব ভদ্রভাবেই উত্তর দিল ছোট্ট রাজকুমার, যদিও ঘুরে দাঁড়িয়ে সে কিন্তু কাউকেই দেখতে পায়নি।

সেই আগের গলায় আবার কে যেন বলল— 'এই যে, আমি এখানে আপেল গাছের নিচে।'

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ছোট্ট রাজকুমার, 'কী সুন্দর তোমাকে দেখতে!'

'আমি শেয়াল'— শেয়াল উত্তর দিল।

'এস না, আমার সঙ্গে খেলবে, আমার ভারি মন খারাপ।'

'কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে খেলতে পারব না', শেয়াল বলল, 'আমাকে তো বশ্যতা স্বীকার করানো হয় নি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে', তাড়াতাড়ি উত্তর দিল ছোট্ট রাজকুমার, 'তুমি কিছু মনে কোরো না'।

কিন্তু একটু চুপ ক'রে ভেবে সে জিজ্ঞেস করল,

'—"বশ্যতা স্বীকার করানো" মানে কী?'

'—তুমি তো এখানে আগে থাক নি', বলল শেয়াল, 'কী খুঁজছ তুমি?'

'—আমি? আমি এখানকার লোকদের খুঁজছি,' বলল ছোট্ট রাজকুমার, 'বল না বশ্যতাস্বীকার করানো মানে কী?'

'—মানুষ?' বলল শেয়াল,— 'ওদের বন্দুক আছে, আর তাই দিয়ে ওরা শিকার করে। সে ভারি বিচ্ছিরি ব্যাপার। আর ওরা মুরগীও পোষে। এ-ছাড়া ওদের আর কোনো কিছুই ভালো লাগে না। তুমি বুঝি মুরগী খুঁজছ?'

'—না তো,' বলল ছোট্ট রাজকুমার, 'আমি বন্ধু খুঁজছি। কিন্তু বলনা "বশ্যতা স্বীকার করানো" মানে কী?'

'—ও কাজটা হচ্ছে কী, খুব কম-ই মনে রাখে লোকে, ওর অর্থ হচ্ছে বাঁধনে বাঁধা।'

'—বাঁধনে বাঁধা?'

'—ঠিক তাই', বলল শেয়াল, 'ছাখো, আমার কাছে তুমি আরো কত হাজার-হাজার

43714

ছোট্ট ছেলের মতোই একজন, তার বেশী কিছু তো না। আর তোমাকে দিয়ে আমার কোনো দরকারও নেই; আবার তোমার দিক থেকে তোমারও আমাকে কোনো দরকার নেই। তোমার কাছে আমি আরো কত হাজার-হাজার শেয়ালের মতোই একজন, তার বেশী কিছু না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে বশ্যতা স্বীকার করাও, তখন আমাদের দুজনের দুজনকে দরকার হবে। তুমি হবে আমার জন্য পৃথিবীতে সবকিছুর থেকে অন্যরকম। আমি হব তোমার জন্য পৃথিবীতে সবকিছুর থেকে আলাদা……'

'—আমি বোধ হয় একটু-একটু বুঝতে পারছি', বলল ছোট্ট রাজকুমার, 'একটি ফুল আছে এক জায়গায়— আমার ঠিক মনে হচ্ছে সে আমাকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে।'

'—তা হবে', বলল শেয়াল, 'পৃথিবীতে কত রকম জিনিস হয়…'

'—কিন্তু সে তো পৃথিবীতে নয়।' বলল ছোট্ট রাজকুমার।

শেয়াল খুব অবাক হ'য়ে পড়ল :

'—অন্য কোনো গ্রহে?'

'—হ্যাঁ।'

'—সেই গ্রহে শিকারী আছে?'

'—না তো।'

'—ভারি আশ্চর্য! মুরগী আছে?'

'—তা-ও নেই।'

'—কোনো কিছুই পুরোপুরি ভালো হয় না'— ব'লে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল শেয়াল। যাই হোক, সে আবার আগের কথা আরম্ভ করল :

'—আমার এখানে কী ভীষণ একঘেয়ে দিন কাটে। আমি হাঁস মুরগী শিকার করি, মানুষ আমাকে শিকার করে। সব মুরগী এক রকম, আর সব মানুষ এক রকম। আর তাই আমি ক্লান্ত। কিন্তু তুমি যদি আমাকে বশ্যতা স্বীকার করাও তবে আমার জীবন আলো ক'রে যেন সূর্য উঠবে। একজনের পায়ের শব্দ তখন আমি চিনব, যা হবে অন্য সকলের থেকে আলাদা রকম। আর সবার পায়ের শব্দে আমি তাড়াতাড়ি মাটির তলায় লুকোই। তোমার পায়ের শব্দ গানের সুরের মতো আমাকে আমার কোটর থেকে ডেকে আনবে। আর তা ছাড়াও শোনো, দেখছো ঐ যে ওখানে শস্যের ক্ষেত? আমি রুটি খাই না, অত গম আমার কোনো কাজেই লাগে না। ঐ ক্ষেত আমায় কখনও ডেকে কিছু বলে না। তাতে আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোমার চুলে সোনার রঙ। ভেবে দেখ কী ভালো হবে যখন তুমি আমাকে বশ্যতা স্বীকার করাবে। ঐ ফসল, যার রঙও সোনার রঙ, আমাকে মনে করিয়ে দেবে তোমার কথা। আর আমি ভালোবাসব শস্যের ক্ষেতে বাতাস বওয়ার শব্দ…'

চুপ করল শেয়াল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ছোট্ট রাজকুমারের দিকে।

'—যদি ভালো লাগে,···আমাকে বশ্যতা স্বীকার করাও না!' বলল সে।

ছোট্ট রাজকুমার বলল, 'আমি সত্যিই চাই; কিন্তু আমার যে অত সময় নেই। আমাকে বন্ধু খুঁজে বের করতে হবে, আমাকে কত জিনিস জানতে হবে।'

'—শুধু সে জিনিসকেই ঠিক জানা হয়, যাকে বাঁধনে বাঁধা হয়েছে,' বলল শেয়াল। 'মানুষের আজকাল আর কিছুই জানার সময় নেই— যা দরকার হয়, সবই সে দোকান থেকে তৈরী-করা কেনে। কিন্তু এমন দোকান কোথায় আছে যেখানে বন্ধুত্ব কেনা যায়? কাজেই মানুষের আজ আর বন্ধুও নেই। যদি তুমি একজন বন্ধু চাও, আমাকে বশ্যতা স্বীকার করাও।'

'—কী করতে হবে আমাকে তাহ'লে?' প্রশ্ন করল ছোট্ট রাজকুমার।

'—তুমি মোটেই চঞ্চল হ'তে পারবে না,' উত্তর দিল শেয়াল। 'তুমি প্রথমে আমার অল্প দূরে ওহ ওরকম যায়গায়— ঘাসের ওপর বসবে। আমি চোখের কোনায় তোমাকে দেখব আর তুমি কিছু বলবে না। কথায় যত ভুল বোঝাবুঝি। কিন্তু রোজ তুমি আমার আরো একটু কাছে এসে বসবে···'

পরদিন ছোট্ট রাজকুমার ফিরে এল।

'—একই সময়ে এলে আরো ভালো হ'ত, বলল শেয়াল। যেমন ধর, তুমি যদি রোজ চারটের সময় আস, তবে তিনটের থেকে আমার খুশী লাগতে আরম্ভ করবে। ঘণ্টা যত এগোবে, আমার তত আরো-খুশী লাগবে। চারটে যখন বাজছে, ততক্ষণে আমি চঞ্চল হ'য়ে পড়েছি, আমি ভাবতে আরম্ভ করেছি; তোমাকে আমি দেখাব আমার সুখ কত! কিন্তু যদি তুমি যখন-তখন আস, আমি তো জানতেই পারব না কখন আমার মনকে প্রস্তুত হ'তে হবে তোমার জন্য। প্রথা মানতে হবে তো।'

'—প্রথা কী?' বলল রাজকুমার।

'—প্রথাও এ রকম কাজ যা লোকে বড্ড বেশী উপেক্ষা করছে', বলল শেয়াল—'এই সব বিশেষ কাজেই তো একটা দিনকে অন্য দিনগুলোর থেকে, একটা ঘণ্টাকে অন্য ঘণ্টাগুলোর থেকে আলাদা ক'রে রাখে। যেমন দেখ না, আমাকে যারা শিকার করে তাদের একটা প্রথা আছে: প্রত্যেক বিষ্যুদবার তারা গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে নাচে। আর, কাজে-কাজেই বিষ্যুদবার আমার কী মজা! আমি ঘুরতে-ঘুরতে আঙুরক্ষেত পর্যন্ত চ'লে যাই। কিন্তু যদি শিকারীদের নাচের কোনো ঠিক সময় না থাকত তবে দিনগুলো সব এক রকম হ'য়ে যেত, আর আমি কখনোই পেতাম না আমার ছুটি।'

এরপর ছোট্ট রাজকুমার শেয়ালকে বশ্যতা স্বীকার করালো। যখন যাবার সময় এল:

'—হায়!' শেয়াল বলল···'আমি কাঁদব।'

'—এ তোমার নিজের দোষ', বলল ছোট্ট রাজকুমার, 'আমি তো কখনও তোমাকে দুঃখ দিতে চাই নি, কিন্তু তুমি চেয়েছিলে আমার কাছে বাঁধা পড়তে.....'

'—নিশ্চয়ই', বলল শেয়াল।

'—কিন্তু এখন তো তুমি কাঁদবে।' ছোট্ট রাজকুমার বলল।

'—নিশ্চয়ই', বলল শেয়াল।

'—কিন্তু তুমি তো এর থেকে পেলে না কিছুই!'

'—আমি পেয়েছি,' শেয়াল বলল, 'এ শস্যের সোনার রঙ।'*

* 'ছোট্ট রাজকুমার' বইয়ের অংশ

চ্যারিটি ফাণ্ড

চন্দ্রাবলী নাগ

খট্ খট্ ক'রে জুতোর শব্দ তুলে একটা নিষ্ঠুর দম্ভের প্রতিমূর্তির মতো অসিত সরকার চ'লে গেল। ঘৃণা আর তিক্ততায় আমরা কেউ কথা বলতে পারছিলাম না। স্তম্ভিত অবসন্নতায় এতগুলো মানুষের সব কয় জোড়া চোখ শুধু স্থির হ'য়ে রইল। 'Heartless creature!' প্রথম কথা বললেন খগেন বসাক— 'মনুষ্যত্ব ব'লে কোনো বস্তু নেই ওর মধ্যে!' একসঙ্গে সকলের মুখ খুলে গেল; আমাদের ঘৃণায়-শিউরে-ওঠা মনের সমস্ত তিক্ততা ঢেলে দিলাম। '—চ্যারিটি ফাণ্ডকে বলল চালবাজী, ছি, ছি, সামান্য কটা টাকা— না দিবি তো না দে, তা ব'লে এই কথা!' লোকটার দুঃসহ স্পর্দ্ধায় আমরা যেন অপমানে ছটফটিয়ে উঠলাম, দত্তদা সিনিয়ার ক্লার্ক; চুপচাপ মানুষ, সাতে-পাঁচে থাকেন না; তাঁকেও আজ বলতে শুনলাম—'লোকটা দাম্ভিক, রূঢ়ভাষী জানতাম, কিন্তু এত জঘন্য তা কখনও ভাবতে পারিনি।' ডেসপ্যাচ সেকশনের হারাধন মল্লিকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাগে ঘৃণায় কুৎসিত মুখটা আরো বিকৃত হ'য়ে গেছে। সবচেয়ে বেশী চটেছেন বোধহয়। কারণ উনিই এই ফাণ্ডের সেক্রেটারী, তাই প্রত্যাখ্যানের অপমানটা সোজাসুজি ওঁর গায়েই লাগে। রাগে ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, শুধু একটা অত্যন্ত অশালীন গালাগাল দিলেন। রাগের আতিশয্যে কথার মাত্রা রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না আমাদের পক্ষে।

আশ্চর্য! নামের সঙ্গে মানুষের এত প্রকট সাদৃশ্য বুঝি অকল্পনীয়। না; চেহারার দিক থেকে ধরলে অসিত সরকার কালো নয়, বরং শীর্ণ, পাকানো শরীরে অতিরিক্ত ফর্সা রঙটা অস্বস্তিরই উদ্রেক করে। কিন্তু মনটা নিকষ কালো, দন্তে নিষ্ঠুরতায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত কিছুর প্রতি এক সুবিপুল ব্যঙ্গে আর বিদ্রূপে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে। তবু লোকটা যে এতটা ছোটলোক চামার তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি নি। অথচ ভাবলে খটকা লাগে, তিনদিন আগে এই বেয়ারা কেশব পালকে নিয়েই ওকে মিস্টার সানিয়ালের সঙ্গে ফাটাফাটি ক'রে ঝগড়া করতে দেখেছি। আমাদের সেদিনের বিস্ময় আজকের বিস্ময়ের চেয়ে কিছু কম নয়। আমাদের ফার্মের ডিরেক্টর সুজয় সানিয়াল একজন উঠতি বিজনেস ম্যাগনেট। সম্পত্তিটা তেমন বেশী না থাকলেও নতুন প্রতিপত্তির ঝাঁঝটুকু আছে পুরোমাত্রায়। কাজেই আমরা কর্মচারীরা সর্বদাই সশঙ্কিত। একদিন হঠাৎ হৈ-চৈ-এর শব্দে গিয়ে দেখি অসিত সরকার ডিরেক্টরের ঘরে গিয়ে টেবিল চাপড়ে চীৎকার করছে। পাশে কাঁচুমাচু মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে বেয়ারা কেশব পাল। অসিত সরকারের কথাগুলো কানে আসতেই চমকে গেলাম— 'মাইনে দেন? কী মাইনে দেন আপনি! আপনার ফার্মে তের বছর কাজ ক'রেও কেশব চল্লিশ টাকা মাইনে পায়। চল্লিশ টাকায় তো মশাই আপনার ল্যাপডগটার খরচও চলে না। অথচ কেশবের ফ্যামিলি মেম্বার হচ্ছে···' পুরো কথাটা শুনতে পাইনি, তার আগেই ডিরেক্টর আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে বললেন 'কেশব এখানে ভীড় করতে বারণ ক'রে দাও।' তারপর আর দাঁড়িয়ে থাকার মতো সাহস আমাদের ছিল না। চ'লে আসতে-আসতে শুনেছিলাম অসিত সরকার দুঃসহ স্পর্ধায় তখনও চেঁচাচ্ছে। ডিরেক্টর কতটা চটেছিলেন জানি না, কিন্তু আমরা বিলক্ষণ চটেছিলাম, কারণ মনে হয়েছিল আমাদের দুর্বলতাকে বিদ্রূপ করার জন্যই ও গলাটাকে আরো একধাপ চড়িয়েছিল।

টিফিনের সময় ডিরেক্টরের পি. এ. বিজয় দে-কে গিয়ে ধরলাম সকলে। 'আর বলবেন না দাদা'— বিজয় বাবু বললেন, 'আশ্চর্য ইম্পার্টিনেণ্ট লোক মশাই, ডিরেক্টরের সঙ্গে কী হম্বিতম্বি, যেন কথা বলছে ওর সাবঅর্ডিনেটের সঙ্গে— একেবারে চাষা।' সমস্বরে সমর্থন ক'রে আমরা জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী। বিজয় দে-র মুখেই শুনলাম যে কেশবের হ'য়েই বলতে গিয়েছিল অসিত সরকার। দুমাস ধ'রে প্রচুর কামাই হয়েছিল কেশবের। এ-মাসে মাইনে কাটা গেছে, পেয়েছিল উনিশ টাকা। কেশব এসে পায়ে ধরেছিল ডিরেক্টরের— ওর বৌয়ের অসুখ, ছেলের অসুখ, বাড়ীতে আর কেউ নেই— এরারকার মতো মাপ ক'রে দিতে। তারপর এসেছিল অসিত সরকার, টেবিল চাপড়ে চেঁচিয়ে ছিল। ডিরেক্টর অবশ্য কোনো কথায় কর্ণপাত করেন নি। কেশব তারপর দিন অফিসে আসে নি, আমরা মাথা ঘামাই নি কেউ।

খবরটা পাওয়া গেল তারও পরের দিন সকালে। আমাদেরই এক বেয়ারা এসে

জানাল কেশব আগের দিন দুপুর বেলা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। শুনে চমকে উঠলাম। ও বলল, 'কেশবের ছেলেটা পরশু সন্ধে বেলা মারা গেল, হাতে পোড়ানোর টাকাও ছিল না। বস্তির লোকেরা সবাই মিলে কোনোরকমে টাকা জোগাড় করেছিল। কাল বেলা দশটা নাগাদ ও বেরিয়েছিল; কারো বারণ মানল না। বেরিয়ে গিয়ে এই কাণ্ড করেছে। কেশবের বউটারও ভীষণ অসুখ. কে জানে বাঁচবে কিনা।' খবর শুনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি নি কেউ, সারা আফসটা থমথম করছিল যেন। মিঃ সানিয়াল শুনেই বেরিয়ে এলেন। হৃদয়বান মানুষ, প্রশংসা না ক'রে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেলেন গাড়ি নিয়ে। শুনেছিলাম প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

সেদিন আর কাজ-কর্ম কিছু হ'ল না। পরদিন একটা ছোটখাট শোকসভা মতনও হ'ল। মিঃ সানিয়াল আমাদের অনুরোধ করলেন অফিস থেকে কেশবের স্ত্রীর জন্য কিছু টাকা তুলে দিতে। হারাধন মল্লিক চ্যারিটি ফাণ্ডের সেক্রেটারী হলেন।

সেদিনই টিফিনের সময় কথাবার্তা হাচ্ছল চ্যারিটি ফাণ্ড নিয়ে। অসিত সরকারকে দেখে আমিই ডাকলুম। সকাল বেলা ছিল না ও, তাই বোধহয় চ্যারিটি ফাণ্ডের খবরটা জানত না। আমার মুখে শুনে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইল এক মিনিট। তারপর বলল, 'এ আবার কী একটা নতুন চালবাজী হ'ল?' 'চালবাজী!!' ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধহয় কেউ এতটা চমকাত না। হারাধনবাবুর কণ্ঠে অস্ফুট স্বর বেরোয়—'কী বলছেন।' অসিত সরকার আর এক ধাপ গলা চড়িয়ে বলল, 'ঠিক বলছি, চালবাজী নয়ত কী? ও-সব চ্যারিটি ফাণ্ডের ব্যাপার আমার জানা আছে, ওর মধ্যে আমি নেই।' - বিদ্রূপের হাসিতে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল। হাসিটা আমাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চ'লে গেল অসিত সরকার। প্রথমে সমস্ত ঘরটা অসহ্য বিস্ময়ে যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল, তারপর ফেটে পড়ল ঘৃণা, রাগ আর অপমানে।

আরো দিন পাচ ছয় পর। শ আটেক টাকার মতো উঠে গেছে এরই মধ্যে। টিফিন রুমে ব'সে হারাধন মল্লিকের কৃতিত্বের প্রশংসা করছে সবাই মিলে। এমন সময় অসিত সরকার এসে হাজির। ঘৃণায় বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকোলাম আমরা, কথা থামালাম না। কিন্তু অসিত সরকার নিজের থেকেই প্রশ্ন করল, 'কত টাকা উঠল মশাই আপনাদের ফাণ্ডে।' 'আট শো'— বাধ্য হ'য়ে জবাব দিতে হ'ল। 'কিন্তু কাকে দেবেন টাকাটা', আবার প্রশ্ন করল। 'কেশবের স্ত্রীকে'— পূর্ববৎ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম। অসিত সরকারের মুখে আবার সেই বিদ্রূপের মৃদু হাসিটা ফুটে উঠল, আমাদের আপাদ-মস্তক জ্ব'লে উঠল রাগে। কিছু বলার আগেই ও কথা বলল, 'কিন্তু কেশবের স্ত্রী তো নেই।' 'নেই মানে?' 'মানে, মারা গেছে দিন দুয়েক আগে, হার্ট ফেল করেছে।' 'সে কী!' বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে বলি। 'একেবারে বেইমান, আপনাদের মহানুভবতা দেখাবার চান্সটা পর্যন্ত দিল না।'— অসিত সরকার হুল ফোটাল; তারপর একটু থেমে আবার বলল

'এতগুলো টাকার দরকার ছিল না মশাই, শুধু আর কটা দিন আগেও যদি কেশবকে অন্তত চল্লিশটা টাকাও দিত ডিরেক্টর তবে তিনটে জীবন হয়তো শেষ হ'য়ে যেত না, আর চ্যারিটি ফাণ্ডেরও দরকার হ'ত না।' কথা শেষ ক'রে অসিত সরকার সেদিনের মতোই খট্ খট্ জুতোর শব্দ তুলে চ'লে গেল— একটা উদ্ধত দাম্ভিক মূর্তি। আর অসহ্য রাগে জ্ব'লে উঠতে গিয়েও কেন জানি না অপরিসীম লজ্জায় আমরা কেউ মাথা তুলে কারো দিকে তাকাতে পারলাম না।

হিন্দু কলেজের কথা : 'কেন্দ্র'

১৮১৭ সাল হইতে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ডেন্‌সেলেম সাহেব হিন্দু কলেজের হেড মাষ্টর ছিলেন। তাঁহার সময়ে টাইটলর, রস, থিওডর ডিকেন্স এবং জন পিটার গ্রাণ্ট ইঁহারা অন্যতর শিক্ষক ছিলেন। টাইটলার সাহেব সাহিত্য ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একজন বিলক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যা উত্তমরূপে জানিতেন। এতদ্ব্যতীত পারসী ও আরবীতে বুৎপন্ন ছিলেন ও সংস্কৃত অল্প অল্প জানিতেন। তিনি একটি কেন্দ্র ছিলেন। ইংরাজী "eccentric" শব্দ আমি "কেন্দ্রবর্জ্জিনী ভাববিশিষ্ট" এই বাক্য দ্বারা অনুবাদ করিয়া থাকি। মনুষ্য সংক্ষেপপ্রিয়, অতএব ঐ বাক্যের সঙ্কোচ করিয়া লইয়া কেন্দ্রবর্জ্জন ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিকে শুদ্ধ "কেন্দ্র" বলিয়া ডাকিয়া থাকি। টাইটলার সাহেব একটি "কেন্দ্র" ছিলেন। তিনি এক দিবস তাঁহার বালক পুত্রের ছাগলের গাড়ি চড়িয়া কেল্লার মাঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহেবেরা দেখিয়া অবাক। যে দিবস তাহার ছাত্রেরা ম্যাথেমেটিক্স শেখা ফাঁকি দিবার ইচ্ছা করিত, সে দিবস তাহাদিগের মধ্যে একজন একটি সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিত। হয়ত তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিত "নলিনী-দলগতজলবৎ তরলং" তিনি বাঙ্গালায় বলিতেন "কি বলিলে আবার বল, কি অর্থ ইহার"। এইরূপে শ্লোকের অর্থের বিচার করিতে করিতে সময় কাটিয়া যাইত, ম্যাথেমেটিক্স পড়া হইত না। একদিন তাঁহার ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তকে "crawl" শব্দ পাইয়াছিল। তাহারা দুষ্টামি করিয়া বলিল যে আমরা ঐ শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি না। তিনি তাহার অর্থ নানা প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, তবু তাহারা কিছুই বুঝে নাই, এইরূপ ভাণ করিল। পরিশেষে তিনি কি করেন, নিজে ভূমিতে "crawl" করিয়া দেখাইয়া দিলেন।

রাজনারায়ণ বসু : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (শক ১৭৯৭)

দুটি জর্মন কবিতা

অনুবাদ : সুজিতশংকর চট্টোপাধ্যায়

যখন তুমি এসেছিলে

যখন তুমি এসেছিলে
মুখটি ছিল ফাগুন-রাঙা
হৃদয়ে ছিল মাঘের শীতলতা।

যখন তুমি যাবে ফিরে
চোখের পরে মাঘের তুষার
হৃদয়ে কেন চৈত্র-ব্যাকুলতা ?

Heine-র Das Buch der Lieder থেকে

বৃষ্টি আনে খবর

বৃষ্টি আনে খবর— যা শুধু আমারই জন্য
বর্ষণে বর্ষণে ছড়িয়ে পড়ে
স্লেটের ছাত থেকে টালির ছাতে,
জ্বরের পূর্বাভাসের মতো ;
চোরাই মাল যেন এনে দেয় তারই কাছে
যে তাকে চায় না।
শব্দ ওঠে কাচের শার্সিতে
অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা হয় লিপি
বৃষ্টির সে ভাষা, মনে হয়, বুঝি একা আমিই।

বিস্মিত বেদনায় শুনি আমি সেই বাণী
খবর সে হতাশায়, দৈন্যের আর ভর্ৎসনার।

ব্যথা পাই মনে, কারণ অনুভূতি বলে,
আমি নির্দোষ।
জানিয়ে দিই জোর গলায়
ভয় পাইনে আমি বৃষ্টিকে, তার অভিযোগকে,
আর যে তা পাঠিয়েছে তাঁকে ;
সময় হ'লে দাঁড়াব তার সামনে
জবাব দিতে, তাঁর হিসেব নিতে !!

Nachricht des Regens : Gunter Eich

সাতশো রজনীর অভিনয়

সুমিত মিত্র

তার চেয়ে আলোটা নিভিয়ে দিও।
শীতের হাওয়া আর এ-বয়সে সয় না,
রোদ না, আলো না,
বৃষ্টি না, শীত না,
ঋতুর মিছিলের দিন আর ভালো লাগে না।
বিস্তর দিন গেল এ-সমস্ত দেখে,
বিস্তর সময় হ'ল এ-সব পরিচিত ইয়ার্কির সঙ্গে
নতুন ক'রে ভাব জমিয়ে—
তবু অনেকদিন খুব উজ্জ্বল আলোর মুখ দেখলাম না
আলো, অনেকদিন তোমার খুব উজ্জ্বল মুখ দেখলাম না ;
অন্ধকার,
বহুদিন তোমার জঠরেও কোনো
গভীর নির্জনতার আস্বাদের প্রতি যাই নি
চিরাভ্যস্ত নাতিশীতোষ্ণতায়,
প্রথাগত ঈশ্বর-নিস্পৃহতায়,

কুমীরের মতন ডুব-সাঁতার দিয়ে কাটছে কাটুক,
(কারণ প্রথম রাত্রির অভ্যস্ত উত্তেজনা নির্বাপিত)
কাপাস তুলোর আঁশে-আঁশে শেষরাতের অবসাদ।
কাল সকালে
আবার কাল সকালে
লোহাপেটা রোদ্দুরের মুখ দেখার আগে
তুমি
আলোটা
নিভিয়ে
দিও।

দুটি কবিতা

অতীশকুমার দাশগুপ্ত

আগামী

চিনারের পাতারা
চুপ
শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো
চৌচির
ঝলমলে প্রাসাদে
অন্ধকার
গমগমে কাফেতে
কাপের টুকরো ;

তারপর
ইতিহাস ওল্টাবে পাতা,
মৃত্যুর হাত ধ'রে
রাত হবে ভোর,

শোনা যাবে অস্ফুট
যুগবদলের আগমনী :

গুলিবিদ্ধত মা-কে জড়িয়ে
একটি শিশু
কাঁদছে কেবলি।

ভাবছিলাম

সমস্ত প্রদর্শনী
ঘুরে ঘুরে
আমরা দুজনে বেশ
ভ্যান গ্যঁ পিকাসো
আর অবন ঠাকুরের
পট দেখব

সমস্ত বইয়ের দোকান
ঘুরে-ঘুরে
আমরা দুজনে বেশ
গোর্কি রেমার্ক
কিংবা জীবনানন্দের
বই ঘাঁটব

সমস্ত ফুলের বাজার
ঘুরে ঘুরে
আমরা দুজনে বেশ
শিউলি বকুল
অথবা রজনীগন্ধার
গুচ্ছ খুঁজব

আমাদের
মাটির ঘরে জ্বলবে ধূপ
মেঝেয় আলপনা
সারা রাত জ্যোৎস্না লুটোপুটি খাবে
সারা দুপুর মেঘলা বাতাস গান গাইবে

এ-ই-স-ব
মজার মজার গল্প ভাবছিলাম
ভাবছিলাম
সুখের সাথে করমর্দন হয় না
অনেকদিন।

অগ্রজার নির্দেশ

মালিনী বসু

এ-আলো জ্বালিয়ে রাখিস, বোন আমার, কৌমার্যপ্রদীপ!
অনুভব দরকার ভেবে কিনতে যাসনে বাজারে।
ফেনিল মেলাতে ঝলে বহুস্থানে অপূর্ব ব-দ্বীপ—
সমস্তে পৌঁছতে গিয়ে কত বোন হারাল আধারে।
সব দেখে, ভেবেছিল, কাকের আগে গ্রামে ফিরবে সতী;
কেউ আইবুড়ো হ'য়ে ম্লান সাধ মেটায় আয়নায়—
দুপুরে কে নষ্ট হ'ল, কাঁকন কিনে মানল নিয়তি,
পুরনো পাঁচিল, চেনা গলি আর খুঁজতে যায় না।
তুই গর্ভগৃহে থাক, বোন আমার, সতীত্বপ্রদীপ!
পরিশুদ্ধ সুখ মৃত্যু চুম্বনের আশায় নির্জন।
শত যুগ পরে হয়তো একটি শিশু সত্যের সমীপে
যেতে চাইবে; দেখবে, কাল স্বস্থ এক রাত্রির মতন
গ্রহতারা ভুলে গিয়ে আগলে রেখেছে তোর ধন।
বহু হাতে ঘুরে সব শাণিত শবাব যাবে নিভে।

নায়ককে প্রচ্ছন্ন রেখে

দীপংকর দাশগুপ্ত

অভিনীত চরিত্রের সাথে একীভূত হওয়াটাকেই যাঁরা চরিত্রাভিনয়ের আদর্শ ব'লে মনে করেন তাঁরা হয়তো ইংলণ্ডের সেই প্রসিদ্ধ ট্রাজিক অভিনেতাকে সন্দেহের চোখেই দেখবেন। জনশ্রুতি, তিনি হ্যামলেট চরিত্রের রূপদানকালে একাগ্রচিত্তে সান্ধ্যকালীন আহারের কথা চিন্তা করতেন। ভাবসমুদ্রে নিমজ্জমান দর্শক তাঁর এ-আচরণে প্রতারিত হলেন কিনা সেটা বিতর্কসাপেক্ষ— কেন না শোনা যায় যে এই বিশিষ্ট চরিত্রটির অভিনয়ে তাঁর সমকক্ষ খুব অল্পসংখ্যক অভিনেতারই আজ অবধি সাক্ষাৎ মিলেছে।

মনস্তত্ত্বের সাথে আমার পরিচয় সামান্যই— আর চরিত্র-বিশ্লেষণের অস্বস্তিকর অভিপ্রায়ও আমার নেই। কিন্তু নিতান্ত প্রাকৃত ব্যক্তিকেও মানুষের মনোজগতের দুর্জ্ঞেয় রহস্য সম্পর্কে চিন্তাকুল ক'রে তোলে এমনও কোনো-কোনো ঘটনার কথা শোনা যায়। মানুষের জীবনে এ-সব ঘটনা সাধারণত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতির অপেক্ষা না রেখেই দেখা দেয়। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের যে-সন্ধ্যাটিতে জেমস হ্যামিলটনের ডাক্তারখানায় মূর্তিমান বিষাদের মতো ক্ষীণকায় একজন মানুষ এসে প্রবেশ করলেন, সে-সন্ধ্যাটিকে কোনোক্রমেই অসাধারণ বলা চলে না। তাই অসুখের উপসর্গ জানবার জন্যে ডাক্তারবাবু অন্যান্য দিনের মতো বাঁধা-ধরা সুরেই তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। কিন্তু, যা শুনলেন তাতে বুঝলেন যে অসুখটা ঠিক মেটিরিয়া মেডিকা-র আওতায় পড়ে না। সংক্ষেপে ভদ্রলোকের অসুখটা এরকম— তাঁর চোখে-মুখে অপরিমেয় হতাশা ফুটে উঠেছে যার অন্তর্নিহিত কারণ তাঁর চারদিকের দুর্দশা ও হাহাকার। জীবন তাঁকে শুধুই হতাশা দিয়েছে— অপরিসীম হতাশা। এ-হতাশার থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে না পেলে আত্মহত্যারই শরণ নিতে হবে তাঁকে। অসুখটা সাধারণ নয়— তাই তাঁর চিকিৎসাও হ'ল কিঞ্চিৎ অসাধারণ। সহরে তখন এক বিখ্যাত সার্কাস দল তাঁবু গেড়েছে— প্রতিটি শো-তে লোকে লোকারণ্য। দলের ক্লাউন গ্রিমল্ডি-ই ছিল এই জনপ্রিয়তার মূলে। ডাক্তার রুগীকে আশ্বাস দিলেন যে নিঃসন্দেহে গ্রিমল্ডি পৃথিবীর সবচাইতে মজার লোক, এবং অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না হ'লেও গ্রিমল্ডি নিশ্চয়ই তাঁর রোগের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে।

ঘটনাচক্রে গ্রিমল্ডি-ই ছিলেন সেই রুগী, এবং তাঁর পরিচয় পেয়ে ডাক্তারের মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল সে-কথা ভেবে আমরা অনর্থক সময় নষ্ট করব না; পুরাকালের কোনো মুনি ঋষি হ'লে তিনি অবশ্যই পুরুষস্য চরিত্রং ইত্যাদি তত্ত্বের অবতারণা ক'রে বসতেন।

অভিনয় সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতা নেই— কাজেই অভিনেতার অভিনয়কালীন মনোভাব সম্বন্ধে মতামত জাহির করাটা হয়তো আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে। ওয়াইল্ড লিখেছিলেন. 'To reveal art and to conceal the artist is art's aim।' অর্থাৎ শিল্পের বিকাশ হবে শিল্পীকে প্রচ্ছন্ন রেখে। অভিনেতার জীবনে এ-উক্তিটি বোধহয় অত্যন্ত করুণভাবে সত্যি। শিল্পীর শুধু নিজেকে গোপন রাখলেই চলবে না, তাকে সাময়িকভাবে নিজের অস্তিত্বকে, নিজের অনুভূতিকে একেবারেই ভুলে থাকতে হবে। নতুবা ফলাফলটা মর্মান্তিক হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা। সহস্র চক্ষুকর্ণের সতর্ক প্রহরার সামনে য়ে-বেচারা মঞ্চের ওপরে বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে তার অবস্থাটা কি কখন বিবেচনা ক'রে দেখেছেন? তিনি যখন হাসছেন তখন তাঁর আদপেই হাসি পাচ্ছে না এবং যখন তাঁর ভয়ানক হাসি পাচ্ছে তখন তিনি প্রাণপণে হাস্য সংবরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথবা যে-ভদ্রলোকের চরিত্র রূপায়িত হচ্ছে তার কথাটাও একবার ভাবুন। তিনি তো অমানুষ— অন্ততঃ অসাধারণ তো রটেই। কারণ সাধারণ লোকে যে-সব কাজকর্ম ক'রে থাকে সেগুলোর প্রতি তার অনন্ত বিতৃষ্ণা। এই বিতৃষ্ণার জন্য দায়ী কে? আপনি, অর্থাৎ দর্শক। যেমন মনে করুন যদি সাজাহান মঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে সশব্দে হেকে ওঠেন তবে আপনি কী করবেন? অর্থাৎ দর্শক হিসেবে কী করা আপনার কর্তব্য হবে? আপনি সরবে প্রতিবাদ না জানাতে পারেন— উচ্চগ্রামে অট্টহাস্য না করতে পারেন, কিন্তু নীরব যে আপনি থাকবেন না সে আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। কিন্তু আপনি একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে দেখুন— এটা কী বিশ্বাসযোগ্য যে সাজাহান তার জীবনে কোনোদিন হাসেন নি। "রোমিও এণ্ড জুলিয়েট" নাটকে যদি '——' -কুমার অকস্মাৎ নিজেকে Tybalt আর '——' -কুমারকে Mercutio মনে করতে শুরু করেন, তবে পরিণামে অনাবশ্যক কিছু রক্তপাত সকারণেই আশঙ্কা করা যেতে পারে। এবং এর চেয়েও অনেক বেশী হৃদয়বিদারক হবে যদি '——' -কুমার '——' -কে জুলিয়েট ভেবে বসেন। বেচারার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে আপনারও কান্না পাবে।

বাংলাদেশেরই এক অভিনেতা ছিলেন, রাম চরিত্রে যার অভিনয় মঞ্চজগতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। অভিনয়ের পর অভিভূত কোনো এক দর্শক সিক্তহৃদয়ে তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে যান। গ্রীনরুমের দরজায় পৌঁছোতে একটি জড়ানো কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ভেসে এল—'সীতে, দুটো বিড়ি দে তো!'

অনাদিকাল থেকে যে-সব শহীদের দল মঞ্চযুদ্ধে তাদের প্রাণবিসর্জন দিয়ে এসেছেন তাদের কথাটাও একবার চিন্তা করা প্রয়োজন। একদা প্রলয়ংকর যুদ্ধের পর মঞ্চ যখন শবদেহে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল, তখন দর্শকরা উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন— 'এনকোর, এনকোর!' উৎসাহের আতিশয্যে মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল। অচিরেই রুধিরসিক্ত কলেবরে ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পুনর্বার রণলিপ্ত হ'ল সৈনিকের দল।

'আশ্রমমৃগের মতো অকুতোভয়' যে-সব ছারপোকার দল মঞ্চের উপর ভ্রমণ ক'রে বেড়ায় তাদের সম্বন্ধে যাঁরা অবহিত আছেন তাঁরা হয়তো এটার অন্য ব্যাখ্যা করবেন·····।

আপনিই বলুন, উপযুক্ত পরিমাণে ছারপোকা থাকলে মৃত কি বাঁচতে পারে না ?

ঐতিহাসিক টনি

অধ্যাপক সুবোধকুমার মজুমদার

উনবিংশ শতকে কয়েকটি ইংরেজ আভজাত পরিবার মননশীলতা, কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বগুণে সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করে। ব্যাবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে অভাবনীয় সফলতা এদের জীবনকে সুখী ও সচ্ছল ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এরা ধন আহরণকেই জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে মনে করে নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ও মনন-চিন্তনের ক্ষেত্রে তারা যে-স্বাক্ষর রেখে গেছে তাতে প্রমাণিত হয় যে, লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করলেও, তারা সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি। এদের বংশধরেরা ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রেষ্ঠ পদ অলংকৃত করে, মন্ত্রী-সভার সদস্য হয়, ধর্মাধিকরণ ও সামরিক বিভাগেও একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপিত করে। এই পরিবারগুলি বহু ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন ক'রে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখে। ভিক্টোরিয় যুগে ইংলণ্ডের প্রাচুর্য, শান্তি ও প্রগতিশীল ভূমিকার মূলে আছে এই অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক অবদান।

এমন একটি উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারে রিচার্ড টনির জন্ম। তাঁর পিতা চার্লস টনি কেমব্রিজের উজ্জ্বল রত্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে চার্লস ওখানকার একটি বিভাগীয় সিংহাসন অলংকৃত করতে পারতেন। কিন্তু বাদ সাধল তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য। ডাক্তার বললেন, সুস্থ হ'য়ে বাঁচতে হ'লে তাকে চাকরি নিতে হবে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে। তাই ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশাতেই বাংলা দেশে তাঁর আগমন ঘটল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী, ইতিহাস, দর্শন এই তিন বিষয়ে তিনি সুদীর্ঘ ২৮ বছর কাল অধ্যাপনা করেন, ১৮৬৪ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত। অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছিলেন ১৬ বছর (১৮৭৬-৯২) এবং এর মাঝে দু-একবার শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তাও নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলা দেশে অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালো রকম আয়ত্ত করেন এবং 'কথাসরিৎসাগর' অনুবাদ ক'রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের নিদর্শন রেখে গেছেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর

পুত্র রিচার্ড টনি কলকাতা শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। তবে রিচার্ডের শিক্ষালাভ এদেশে হয় নি। বাল্যকালে রাগ্‌বী স্কুলে ও যৌবনে বেলিয়াল কলেজে তাঁর শিক্ষার সুযোগ হয়েছিল। সম্মানের সঙ্গে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ২৫ বছর এই পদটি অলংকৃত করেন। সার্থক অধ্যাপনা ও মূল্যবান গবেষণায় এই সুদীর্ঘ সময় তাঁর প্রতিভার জ্যোতিতে ভাস্বর হ'য়ে আছে।

রিচার্ড টনি, ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ। কানিংহামের প্রচেষ্টায় কেমব্রিজে যে অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছিল টনি তাতে আকৃষ্ট হন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে ইতিহাস-গবেষকরা অর্থনৈতিক ইতিহাসকে তেমন সু-নজরে দেখতেন না; তাদের মতে অর্থনৈতিক ইতিহাসের কোনোরূপ ঐতিহ্য নেই, বিষয়-গৌরবেও তা কতকটা হীনপ্রভ; তাই অনাদরে একে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন তাঁরা। কানিংহাম ও অ্যাসলির অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলেই বিষয়টি প্রথম জাতে উঠল— বনেদী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-বিষয়টি ছিল Cinderella-র মতো অনাদৃত, উপেক্ষিত ও রান্নাঘরের ক্লান্তিকর আবহাওয়ায় আবদ্ধ, সেটিই এবার মুক্তি পেয়ে ড্রয়িংরুমের সভ্য-পরিবেশে বসবার অনুমতি পেল। তবু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে Cinderella-র ভাগ্যে বরমাল্য তখন-তখনই জুটল না। সে-আমলে ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক ইতিহাসের নিজস্ব অবদান ছিল সামান্যই এবং যা-কিছু ছিল জার্মান আদর্শের অনুকরণে ইংরাজ ঐতিহাসিক তাও সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে ফেলেছিলেন। ঊনবিংশ শতকে ব্যাবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে জার্মানরা ভিক্টোরিয় আমলের ইংরেজ বণিকশ্রেণীর কাছে পরাভব মেনে নেয়। জার্মান শিল্পের তখন শৈশবাবস্থা। একে তীব্র প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাচানোর মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চার সূচনা করলেন— Lisht ও Hildebrand প্রমুখ জার্মান পণ্ডিতগণ। ফরাসী-বিপ্লবপ্রসূত সার্বজনীন-আদর্শ রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যকে পাছে ক্ষুণ্ণ করে, লিওপোল্ড ফন রাঙ্কে সেই আশঙ্কায় কলম ধরেছিলেন, আর 'লেসে ফেয়ার', 'ফ্রি-ট্রেডে'র প্রতিযোগিতায় জার্মান শিল্প যাতে বিপন্ন না হয় সেই উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে জার্মান অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা ইতিহাস-গবেষণা সুরু করেন। রাঙ্কের আদর্শ যদি হয় শক্তিশালী 'রাইখ' গঠন করা— তাঁদের উদ্দেশ্য হ'ল বহির্বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী নাশ করা। ইংরাজ এ্যাডাম স্মিথ্ মুক্তকণ্ঠে ফ্রি-ট্রেড-এর জয়গান গেয়েছিলেন, এবার তার পাল্টা জবাব দিলেন ফ্রেডারিক লিস্ট্ সংরক্ষণ নীতির অকুণ্ঠ সমর্থনে। অবিশ্বাস্য হ'লেও এ-কথা সত্য যে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত, জার্মান ঐতিহাসিকদের আদর্শ-সংরক্ষণ নীতিকে ইংলণ্ডের গবেষকবৃন্দ সাদরে গ্রহণ ক'রে নিলেন। টোরি সরকারের রক্ষণশীল শাসন ও শুল্কনীতির সমর্থন— এই-ই কানিংহাম্ অ্যাসলিপ্রমুখ ঐতিহাসিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় এবং প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত এই খাতেই সমস্ত আলোচনার ধারাটি প্রবাহিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী

PRESIDENCY COLLEGE
LIBRARY, CALCUTTA.

অধ্যায়ে ভিক্টোরিয় সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও বাণিজ্য-বিস্তার— এই ত্রিবিধ-মোহগ্রস্ত ভিক্টোরিয় যুগকে নূতন যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'ল তাতে ইংরেজদের গভীর আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রিক ঐক্য ক্রমশ শিথিল ও লুপ্ত হ'য়ে এল। রাজ্যবিস্তার, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি যে কেবল সব-সুখের আকর নয়, তার মধ্যেও নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হ'তে পারে— এই সত্য ধীরে-ধীরে জাতীয় চেতনায় প্রতিভাত হ'তে থাকল। ভার্সাই-পরবর্তী যুগের আর্থিক সংকটের প্রচণ্ড ধাক্কায় মানুষের জীবন বিড়ম্বিত হ'ল; wasteland-এর মরুভূমিতে ভিক্টোরিয় যুগের অখণ্ড শান্তি ও প্রাচুর্যের উৎসধারা গেল শুকিয়ে। নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন প্রশ্ন নিয়ে একদল ঐতিহাসিক আবির্ভূত হলেন, যাঁদের পুরোভাগে ছিলেন রিচার্ড টনি, আন্‌উইন, কোল ও ওয়েব্-দম্পতি। তাদের আলোচনায় অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বেশী ক'রে স্থান পেল; আর তাঁদের প্রধান অন্বিষ্ট হ'ল সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে সমাজে বর্ণবৈষম্য ও শোষণব্যবস্থা দূর ক'রে সাম্যের প্রতিষ্ঠা।

টনি লেবার পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতিতে লেবার পার্টির প্রগতিশীল ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন। যৌবনে তিনি একথাও ভেবেছিলেন যে লেবার পার্টি হচ্ছে এ-যুগের New Model army— স্বৈরাচার দমন ক'রে একদিন যা সত্যকার স্বাধীনতা এনে দেবে ইংলণ্ডে। টনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে পড়েন। সমাজে ধনবণ্টনের অসাম্য ও ন্যায়নীতির অভাব কত গভীরভাবে তাঁর মনকে পীড়িত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে টনির Equality ও Acquisitive Society— এই দুই গ্রন্থে। এই রচনাগুলির মধ্য দিয়ে তিনি শ্রেণীবিভক্ত বৈষম্য-ক্লিষ্ট সমাজকে সাম্যের বাণী শুনিয়েছেন। প্রতিযোগিতা ও মুনাফা যে-সমাজের প্রধান বুনিয়াদ রচনা করেছে তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। অহং ও শ্রেণীস্বার্থ বিলোপই যে সামগ্রিক তথা ব্যক্তিগত কল্যাণ সে-কথা দৃপ্ত কণ্ঠে বার-বার তিনি ঘোষণা করেছিলেন। Equality (১৯৩১) ও Acquisitive Society (১৯২১)— এই পুস্তকদ্বয়ের মূল সুর সমাজতান্ত্রিক সংগঠন। কিন্তু মনে রাখতে হবে টনির সাম্যবাদী চিন্তাধারা মার্কসীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। তাঁর অন্তর্নিহিত গভীর ধর্মবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠা কখনোই তাঁকে মার্কসবাদের অনুগামী হ'তে দেয় নি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও চিন্তার স্বাধীনতা— এই দুই গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অবিচলিত। তাই ডায়লেকটিক্ বস্তুবাদ নয়— সর্বমানবের প্রতি করুণা-বোধ ও গভীর ধর্মবিশ্বাস থেকেই তাঁর সাম্যবাদের জন্ম। টনির ধর্মবিশ্বাসের মূল সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যাবে John Wesly-র Methodist আদর্শের মধ্যে।

সমাজ-সংস্কারই টনির একমাত্র লক্ষ্য বা আলোচ্য বিষয় ছিল না। তাঁর অসামান্য ধীশক্তি, সদাজাগ্রত কৌতূহল কেবল একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে

বিচিত্র বিষয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কেবলমাত্র মার্কসবাদে দীক্ষিত হ'লে তিনি এত বিস্তৃত বিচরণভূমি ও ব্যাপক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

বিংশ শতকের গোড়াতে, ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ, জার্মান পণ্ডিতমহলে একটি প্রধান আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। ১৯০২ সালে Sombart এবং ১৯০৪ সালে Max Weber ধর্ম ও অর্থনীতির মধ্যে কোনো ওতপ্রোত সম্বন্ধ আছে কিনা এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। বেবর তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করেন যে প্রটেস্টাণ্ট মতবাদের আবির্ভাবের সঙ্গে ধনতন্ত্রের গভীর ও প্রত্যক্ষ যোগ আছে। টনি তাঁর Religion and the Rise of Capitalism গ্রন্থে বেবর-থীসিস্‌কে মোটামুটি অনুসরণ করলেও দু-একটি বিষয়ে জার্মান পণ্ডিতের সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। টনির এই বই প্রকাশিত হয় ১৯২৬-এ কিন্তু এর বহুল প্রচার সম্ভব হয় ১৯৩৭-এ, যখন এর একটি সুলভ পেলিকান সংস্করণ ছাপা হয়। এই গ্রন্থটির সূচনায় টনি ব্যাবসা-বাণিজ্যবিষয়ে খ্রীস্টান শাস্ত্রকারদের সংকীর্ণ মনোভাব ও শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। ধর্মযাজকরা কোনোদিনই বণিক সম্প্রদায়কে সুনজরে দেখে নি। চার্চ চিরকাল ব্যবসায়ে টাকা খাটানো, ঋণের পরিবর্তে সুদ গ্রহণ এবং মূলধন বৃদ্ধির যাবতীয় প্রচেষ্টাকে সুনীতি ও সত্যধর্মের পরিপন্থী ব'লে মনে ক'রে এসেছে। Old Testament-এ কুসীদজীবীদের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা এই মনোভাবের পরিচায়ক। ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ তেজারতি। মধ্যযুগে ইহুদি বণিকরাই এই ব্যবসায়ে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাই এর বিরুদ্ধে খ্রীস্টান চার্চের তীব্র বিদ্বেষের কারণ সহজেই অনুমেয়। কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রী-র সুযোগ্য লেখক তাই মন্তব্য করেছেন—'The anti-Capitalist religious theories of the middle ages had probably a wider acceptance than anti-Capitalist Marxist theories have to-day.' অর্থান্বেষণ ও ধনোৎপাদনের স্পৃহাকে চার্চের বিরোধিতা ও প্রচণ্ড বিদ্বেষ থেকে রক্ষা ক'রে তার মধ্যে একটি মহৎ আদর্শবোধ সঞ্জীবিত করা পিউরিটান সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিদ্রোহী হ'লেও লুথার ছিলেন সংস্কারপন্থী; ব্যাবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে তিনি চার্চের রক্ষণশীল সনাতন অনুশাসনগুলি আঁকড়ে ধ'রে ছিলেন। কিন্তু ক্যালভিন ছিলেন প্রগতিশীল এবং তাঁর মন ছিল অনেক যুক্তিবাদী। তিনি অকারণ বণিকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন নি বা অর্থকে সব অনর্থের মূল ভাবেন নি। বুর্জোয়া বণিক সম্প্রদায় ক্যালভিনের মন্ত্রে নিজেদের জীবনাদর্শকে খুঁজে পেল; এরই মধ্যে তারা নিজেদের উন্নতি ও বিকাশের পথটির নির্দেশ পেল। ঊনবিংশ শতকে কার্ল মার্কস সর্বহারা শ্রেণীর জন্য যা করেছেন— ষোড়শ শতাব্দীতে বুর্জোয়াদের জন্য ক্যালভিন তাই করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পিউরিটানিজম (ক্যালভিনবাদের ইংরাজী সংস্করণ) ইংরেজ মধ্যবিত্তের শিক্ষাগুরু, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্বোধক; এবং ম্যাক্স বেবর-এর মতে ধনতন্ত্রের জনক। টনি এই মত

পুরোপুরি স্বীকার করেননি। তিনি দেখিয়েছেন পিউরিটান মতবাদকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা অর্থগণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বহুমিশ্রিত ভাবধারা এর বিপুল কলেবরকে পুষ্ট করেছে, আকৃতিকে দিয়েছে বিচিত্র রূপ ও শক্তিকে করেছে বহুমুখী। পিউরিটানবাদ কখনও বিপ্লবী-ভূমিকা গ্রহণ ক'রে বেপরোয়াভাবে অগ্রগতির স্রোতে নিজেকে দিয়েছে ভাসিয়ে, কখনও বা রক্ষণশীলতার নামাবলী গায়ে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরেছে চিরাচরিত প্রথাকে। কখনও ব্যক্তির অধীর আবেগে, কখনও সমষ্টির সংহত শক্তিতে তার প্রাণস্ফূর্তি উৎসারিত হয়েছে সহস্র ধারায়। দ্বিতীয়ত ক্যালভিনের ধর্মনীতির সঙ্গে ধনতন্ত্রের কোনো আত্মক যোগাযোগ ছিল না। ক্যালভিন চেয়েছিলেন চার্চের সর্বময় কর্তৃত্ব ও সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ। অন্যদিকে ধনতন্ত্রের মূল প্রেরণা এসেছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাস্পৃহা থেকে। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ নয়। টনির মতে পিউরিটান-মতবাদের মধ্যে একটি মন্ত্র ছিল যা কালক্রমে পরোক্ষভাবে ধনতন্ত্রের সঙ্গে এর মিলন ঘটিয়ে দেয়। এটির নাম 'doctrine of calling.' কলিং দুই প্রকারের— আধ্যাত্মিক ও জাগতিক। ক্যালভিন-পন্থী শাস্ত্রকার বললেন, ঈশ্বরকে জানতে চাওয়া ও তাঁর অপার মহিমায় বিশ্বাসী হওয়া যে-কোনো সাধু খ্রীস্টানের অবশ্যকর্তব্য। আবার ঈশ্বরের আশীর্বাদ ললাটে ধারণ ক'রে যে-ব্যক্তি কঠোর পরিশ্রমসহকারে সকল রকম সাংসারিক কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে— সেও এক ভিন্ন উপায়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে। জাগতিক বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্যুত ক'রে যে সাধুখ্রীস্টান মোক্ষ লাভের স্বপ্ন দেখেন তিনি ভ্রান্ত ; নিছক বৈরাগ্য সাধনেই তার মুক্তির আশা নেই। তার চেয়ে ঈশ্বরের বিধানানুযায়ী সাংসারিক বিষয়ে প্রতিটি গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করলে তিনি অধিকতর রূপে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভে সক্ষম হবেন। ব্যাবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগে দেখা গেল যে, ঈশ্বরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যাবসা-বাণিজ্য শুরু হয় তা মোটেই ধর্মবিরুদ্ধ বা অশাস্ত্রীয় নয়। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মভীরু ব্যবসায়ী যদি পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও স্বাবলম্বী হয় তাহলেই তার ব্যবসায়ে উন্নতির আশা থাকে। ইংরেজ মধ্যবিত্ত এই 'doctrine of calling'-এর মধ্যে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করল,— তাদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত প্রাণশক্তি এতদিনে মুক্তিলাভের একটা পথ খুঁজে পেল।

টনির প্রতিপাদ্য বিষয় পাণ্ডিত্যমহলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। অনেকের মতে টনি-কৃত পিউরিটান-মতবাদের অতি সরল ব্যাখ্যা যে-কোনো বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাতে ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু অত্যাধিক বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি করলেও টনির মতামতের বৈশিষ্ট্য সকলকেই আকৃষ্ট করেছে। Religion and the Rise of Capitalism হচ্ছে সেই জাতের বই যার সব সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞ পাঠক মেনে নিতে পারেন না। অথচ যে-বই প্রকাশের ফলে বিষয়বস্তুর ঘটে আমূল পরিবর্তন। টনির অধিকাংশ রচনা সম্বন্ধেই বোধহয় এই কথা বলা চলে।

ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় টনির মৌলিক অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। দীর্ঘদিন তিনি ট্যুডর ইংলণ্ডের ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত The Agrarian problem of the 16th century গ্রন্থে তিনি তাঁর এই দীর্ঘ সাধনার পরিচয় রেখে গেছেন। আধুনিক কালে গবেষণা-পদ্ধতির পরিবর্তন ও নিত্যনূতন ঐতিহাসিক তথ্যাদি আবিষ্কারের ফলে এই পুস্তকের বহুলাংশ এখন বাতিল ব'লে গণ্য হ'লেও, পথিকৃতের প্রাপ্য যথোচিত সম্মান থেকে টনি এখনও বঞ্চিত হন নি। ১৯২৪-এ শ্রীমতী আইলীন পাওয়ার-এর সহযোগিতায় টনি তিন খণ্ডে Tudor Economic Documents প্রকাশিত করেন। এই অমূল্য আকর গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধ'রে ট্যুডর যুগের জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস-চর্চায় গবেষকদের পথ প্রদর্শন ক'রে আসছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় ট্যুডর যুগ যে অধিকতর আলোকিত, তার মূলে আছে টনির বিখ্যাত ইকনমিক ডকুমেণ্টস।

১৯৪১ সালে ইকনমিক হিস্ট্রী রিভ্যু পত্রিকায়, "জেণ্ট্রি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে টনি একটি ঐতিহাসিক বিতর্কের সূচনা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে গৃহযুদ্ধের এক শতাব্দী-কাল মধ্যে (১৫৪০-১৬৪০) ইংলণ্ডে এক নূতন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই একশ বছরের মধ্যে ইংলণ্ড এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রধানত আমেরিকা থেকে প্রচুর সোনা-রুপো আমদানির ফলেই ইংলণ্ডে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দ্রব্যমূল্য প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রচণ্ড ধাক্কায় ইংলণ্ডে সকল শ্রেণীর লোক সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও — সম্পূর্ণ ধরাশায়ী হ'ল তারাই যাদের আয় সীমাবদ্ধ। রাজা, জমিদার, বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা ও চাষ সকলেই এ-সময়ে নিজেদের বাঁচাবার জন্য জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন। বলা বাহুল্য, জমি বা সম্পত্তি বিক্রয় করার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সামাজিক প্রাতপাত্তও খানিকটা নষ্ট হ'ল। এই দুর্দিনে জেণ্ট্রি সম্প্রদায় (মাঝারি ধরনের জমিদার, ব্যবসায়ী বা আইনজীবী) অন্যান্য শ্রেণীর হস্তচ্যুত জমি নিজেরা কিনে ক্রমশই ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হ'তে শুরু করল। এরা আভজাতশ্রেণী ও কৃষককুলের সর্বনাশের সুযোগ নিয়ে নিজেরা বড় হ'ল। সম্পত্তি বৃদ্ধির নেশায় এরা যে কোনো নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেয় নি তার ইঙ্গিত আছে টনির লেখায়—"The gentry rose to wealth on the crushed bodies of the peasantry." নূতন জমিদার-সম্প্রদায় ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষবাস ক'রে জমিদারির আয় অনেক বাড়িয়ে তোলে। টনির মতে এই শ্রেণীর উন্নতির ফলে সামাজিক ভারকেন্দ্রের আমূল পরিবর্তন ঘটল। এই মত প্রতিষ্ঠায় তিনি দুই রকম সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন— পরিসংখ্যান (statistics) ও সমসাময়িক সাহিত্য। সাতটি কাউণ্টির ২৫৪৭টি ম্যানরে, ১৫৪০ থেকে ১৬৪০ পর্যন্ত, কী ভাবে জমি হস্তান্তর হয়েছে— তার অনুসন্ধানের ফলাফল গ্রহণ করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ত সমসাময়িক দার্শনিক লেখক Raleigh,

Harrington, Neville প্রভৃতির রচনা থেকে টনি অনেক নজির উপস্থিত করেছেন যা তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে সমর্থন করে। টনি আরো বলেছেন যে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে জেন্ট্রি সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবি করে। গৃহযুদ্ধে তারা রাজার বিরুদ্ধে যোগ দেয় এবং জয়ী হ'য়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়। টনি-শিষ্য L. Stone 'The Anatomy of Elizabethan Aristocracy' নামক গবেষণা-নিবন্ধে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে এলিজাবেথের যুগে অভিজাত শ্রেণী ঘোর আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হ'য়ে ক্রমশই হীনবল হ'য়ে পড়ছিল। পরোক্ষ ভাবে টনি-র মতকে তিনি সমর্থন করেছেন।

অধ্যাপক ট্রেভর-রোপার ১৯৫৩ সালে 'ইকনমিক হিস্ট্রী রিভ্যু' পত্রিকায় 'The gentry' নামক প্রবন্ধ লিখে টনি-র জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। যে-সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভর ক'রে টনি তাঁর মতামত গ'ড়ে তুলেছিলেন, ট্রেভর-রোপার সেই নজিরের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক উপসংহারে পৌঁছেছেন। জেন্ট্রির উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই লক্ষ করেছেন ট্রেভর-রোপার এবং অনুযোগ করেছেন টনি-র পরিসংখ্যান ভিত্তিহীন এবং অনুসন্ধান-প্রণালীও বিজ্ঞানসম্মত নয়। তিনি জেন্ট্রি সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই ভিন্ন দল লক্ষ করেছেন—একদলকে বলেছেন "mere gentry", অপরদলকে বলেছেন—"court gentry." যারা জমির উপর বেশী নির্ভরশীল তারা সাধারণ জেন্ট্রি— এরা গ্রামে থাকত ও পুরাতন প্রথায় চাষবাস করত। এদের মধ্যেই ট্রেভর-রোপার ক্রমবর্ধমান অর্থসংকট দেখেছেন। কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় "কোর্ট জেন্ট্রি", রাজদরবারে বড়-বড় চাকরি লাভ ক'রেছিল, রাজার আনুকূল্য লাভ ক'রে প্রতিপত্তিশালী হ'য়েছিল অথবা ব্যাবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত ক'রেছিল। এদের উন্নতি, mere gentry বা পতনোন্মুখ জেন্ট্রির ঈর্ষার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। Cromwell ও তাঁর Independent party-র সদস্যরা এই বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। এঁরা যখন ধন ক্ষমতা, ও সামাজিক মর্যাদা দাবি করেন এবং রাজার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন তখনই ইংলণ্ডের সমাজজীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ট্রেভর-রোপার গৃহযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন : 'The Great Rebellion is not the clear-headed self assertion of the rising bourgeoisie and gentry, but rather the blind protest of the depressed gentry.'

গত পঁচিশ বছর ধ'রে এই জেন্ট্রি-সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র বাদবিতণ্ডা চলেছে। ইংলণ্ডের সকল খ্যাতনামা ঐতিহাসিকই এতে অংশ নিয়েছেন; কেউ সমর্থন করেছেন টনি-কে, কেউ যোগ দিয়েছেন ট্রেভর-রোপার-এর পক্ষে। কিন্তু আজও কোনো স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি।

১৯৫৮ সালে টনি-র সর্বশেষ গবেষণা-গ্রন্থ Lionel Cranfield-এর জীবনী প্রকাশিত হয়। ক্র্যানফিল্ড জ্যাকবিন-আমলের প্রসিদ্ধ বস্ত্র-ব্যবসায়ী, যিনি বিদেশে কাপড় চালান দিয়ে

এবং speculation-এর সুযোগে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন। ধনী ব্যবসায়ী কালক্রমে জেম্‌সের নজরে প'ড়ে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও পরে লর্ড ট্রেজারার হয়েছিলেন। টনি এই গ্রন্থে দেখিয়েছেন লণ্ডন-ব্যবসায়ীদের মূলধনের বিষ-ক্রিয়া সরকারি মহলের উপর-তলায় কীভাবে দুর্নীতি সৃষ্টি করেছে— এবং পরোক্ষভাবে অভিজাত শ্রেণীর সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

টনি-র রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য— প্রসাদগুণ। তিনি অকারণ দুর্বোধ্যতার ধূম্রজাল সৃষ্টি ক'রে তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট করার চেষ্টা করেন নি। তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রচনাশৈলীতে এমন একটি ঔদার্য ও ঋজুতা আছে যার মহিমা আমাদের মিল্টনের গদ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধির আলোকে সমুজ্জ্বল তাঁর বক্তব্যে মননশীলতা ও উইট দুই-ই সমভাবে প্রতিফলিত। ইতিহাসের অনেক জটিল তথ্য পরিবেশনের ফাঁকে-ফাঁকে তিনি এমন সব সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উক্তি ক'রে থাকেন, হীরকখণ্ডের মতো যার জ্যোতি তার সমগ্র রচনাকে আলোকিত করে এবং সেই হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে পাঠকের চিত্তও ঝলমল ক'রে ওঠে। উৎসাহী পাঠক Acquistive Society-র প্রতি পাতায় এমন উক্তির সন্ধান পাবেন। বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এই দুই বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Religion and the Rise of Capitalism গ্রন্থের কয়েকটি অংশবিশেষের উল্লেখ করা যায়, যেমন— রেনাসাঁস আমলে Antwerp শহরের বর্ণনা, কুশীদজীবীদের দুর্দশা বর্ণনা ও পিউরিটান্ আদর্শের ব্যাখ্যা। যে-কোনো ইংরাজী গদ্যের সংকলনগ্রন্থে এই অংশগুলি স্থান পেতে পারে।

অর্থনীতির ঐতিহাসিক হিসাবে টনির স্থান এখনও যথাযথভাবে নির্ণীত হয় নি। পেশাদার ঐতিহাসিকরা তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দিতে রাজি নন। তাঁর লেখা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। অর্থনৈতিক হাতহাস-চর্চায় এগুলিকে সবদা মহৎ গুণ ব'লে ধরা হয় না। অতিরিক্ত প্রাঞ্জল ক'রে কোনো বিষয়কে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করতে গিয়ে তিনি অনেক সময়ে অতি সরল ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হয়েছেন, ঐতিহাসিকের সন্ধানী দৃষ্টি যার মধ্যে অনেক ত্রুটি দেখতে পেয়েছে। তাছাড়া সাক্ষ্যপ্রমাণের গুরুত্ব নির্ণয়ে টনি অনেক সময় অক্ষমতা দেখিয়েছেন— যা অমার্জনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হয়েছে। কিন্তু টনি-র মধ্যে এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে স্বীকার ক'রে নিয়েও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে তিনি হচ্ছেন সেই জাতের ঐতিহাসিক যারা নিত্য নূতন প্রশ্ন জাগিয়ে বুদ্ধিকে শাণিত, কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করেন এবং দুঃসাহসী অনুসন্ধানের পথে ইতিহাস-সেবীকে টেনে আনতে পারেন। নানা বিরুদ্ধ সমালোচনায় মর্মাহত হ'লেও তিনি কোনোদিন বিচলিত হন নি। কারণ তিনি যথার্থই জানতেন যে ঐতিহাসিক মূল্যবিচারে কোনো স্থির বা অভ্রান্ত মাপকাঠি নেই। নূতন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন অনুসন্ধান-প্রণালীর আলোকে ও নবাবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতে অতীতের অনেক স্থির-সিদ্ধান্তই ভেঙ্গে পড়ে—

এবং সেইজন্যই প্রতিপক্ষের দ্বারা বার-বার আক্রান্ত হ'লেও তাঁর মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির সাহায্য নিয়েছি ঃ

(1) R. H. Tawney : Religion & Economic life (*Times Lit. Supplm. Jan. 4, 1956*)
(2) M. Postan : Economic & Social History (*Times Lit. Supplm. Jan. 4, 1956*)
(3) Dr. Amales Tripathi : A Plea for Economic History (*Presidential Address delivered at the Gauhati session of the Indian History Congress 1959*)*

---

* অধ্যাপক শ্রীঅশীনরঞ্জন দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত। সম্পাদক

কলারসিক

শিবানী রায়চৌধুরী

সুরঞ্জন সেন ছবি আঁকতেন, এখন কবিতা লেখেন। সিগারেট খান। পায়ে এদেশী নাগরা, গায়ে বিলিতি পোষাক। শুনেছি অল্প-স্বল্প দেশী-বিদেশী গানও ক'রে থাকেন। আজকাল যাঁদের বিদগ্ধ ব'লে ধরা হয় তিনি হলেন সেই শ্রেণীভুক্ত। তাঁর নেশার কথাই বেশী শুনেছি, পেশা কী, জানা হয় নি। হয়তো বাবার মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স আছে, নয়তো দিদিমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কিংবা ভাবী শ্বশুর এখন থেকেই জামাইকে প্রতি মাসে যৌতুক দিচ্ছেন— শেষেরটারই সম্ভাবনা বেশী— তবে সুরঞ্জনের বান্ধবীরা বলেন যে তাঁর শিল্পের দক্ষিণাই তাঁর খরচ চালাচ্ছে।

দক্ষিণপাড়ার এক পুকুরধারে উচ্চমূল্যের ফ্ল্যাটে সুরঞ্জন থাকেন। আমি যে-দিন গরমকালের সন্ধেবেলায় তাঁর ডেরায় হাজির হলাম তখন তিনি বাইরের ঝুলবারান্দায় আরামকেদারায় গলদঘর্ম অবস্থায় সমাসীন। চারিদিকে বিপর্যস্ত কাগজের স্তূপ— সেগুলি সম্ভবত ছবি। তাঁর সামনের চেয়ারে মুগ্ধচোখে করঞ্জনয়না শ্রীমতী জয়জয়ন্তী দেবী। তখন বাগানের বকুলগাছ থেকে সুগন্ধি হাওয়া বইছিল। শ্রীমতীর হাতে লম্বা মত একখানি পুরনো পত্রিকা।

আমাকে দেখেই সুরঞ্জন ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—'আরে, দেখ তো এই ছবিটা কি আমার আঁকা!' দেখলাম নীলে-হলুদে-লালে-বেগুনীতে মিশ্রিত একটি দুর্বোধ্য ছবি। ছবির তলার নাম দেখে বললাম—'তোমারই তো মনে হচ্ছে।' সঙ্গে-সঙ্গেই জয়জয়ন্তীর

রঞ্জিত ওষ্ঠাধর ব'লে উঠল—'মনে হচ্ছে আবার কা? এঁরই তো আঁকা, দেখতে পাচ্ছেন না?' আমি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে গৃহস্বামীর কানে-কানে জিজ্ঞেস করলাম—'ব্যাপারটা কী? তোমার ছবির খদ্দের নাকি?' মিহিস্বরে জবাব পেলাম—'খদ্দের নয়, এ-রকম একখানি ছবির আবদার জুড়েছেন।'

তারপর শুনলাম কলারসিক শ্রীমতী জয়জয়ন্তী কবেকার পুরনো এক পত্রিকায় সুরঞ্জনের শিল্পকলা দেখে বিমোহিত; এখন তাঁর বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন, অমন একটি ছবি চাই-ই, নহলে তার আগামী জন্মদিন ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। সুরঞ্জনের দুভাগ্য: সে-ছবি কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন। তার আঁকা নতুন-পুরনো সবরকম ছবি দেখাতে লাগলেন।

'এটা আপনার পছন্দ হয়? রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিল।'

দেবী নিরুত্তর। একবার মাথা নেড়ে বোঝালেন—'না'।

'এই যে এই মেঘ-পাহাড়ের ছবিটা একবার দেখুন। পনেরোটা দৈনিক আর ছ-টা সাপ্তাহিকে এর ভয়সী প্রশংসা বেরিয়েছিল।' সুরঞ্জনের গলায় কাতরোক্তি ফুটে বেরুল।

জয়জয়ন্তী একবার শুধু মুখবিকৃতি করলেন।

আরো কয়েকটা ছবি দেখানো হ'ল। কিন্তু কোনোটাতেই দেবীর মন পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সুরঞ্জন মরীয়া হ'য়ে ওরকম একটা ছবি এঁকে দেবেন কথা দিয়ে ফেললেন।

শ্রীমতী কিন্নরকণ্ঠে ব'লে উঠলেন—'ঠিক এমনি হওয়া চাই কিন্তু। হালকা হলুদ আর সমুদ্রের মতো নীল।'

সুরঞ্জন কথা দিলেন—'হ্যাঁ, তাই হবে।'

'আমি মাঝে-মাঝে খোঁজ নেব ছবিটা কতদূর এগোল।' এই ব'লে শ্রীমতী জয়জয়ন্তী নতুন মডেলের গাড়িতে চ'ড়ে অতি আধুনিক কোনো কবির বাড়ি চড়াও করতে চ'লে গেলেন।

সুরঞ্জন ছবি আঁকতে বসলেন। ইজেল, ক্যানভাস, রঙ-তুলি, সব সাজানো হ'ল। পাশে ফোনের কানেকশন রইল। দেখা যাক, শ্রীমতী কখন কী মত বদলায়।

ছবি আঁকা শুরু হ'ল। একটু ক'রে আঁকা হ'তে লাগল, আর ফোনের ওপার থেকে সেই পুরনো পত্রিকাটি হাতে নিয়ে জয়জয়ন্তী নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন—'আচ্ছা, এবার একটু বেগুনী রঙ লাগান। কেমন বেগুনী বুঝলেন, সেই যে উনিশশো আটান্ন সালের জন্মদিনে আমি যেমন ঢাকাই শাড়ি পরেছিলাম।'

সুরঞ্জন মনে করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিফল হলেন। গত পাঁচবছরের অনেক রঙ মনের মধ্যে গোলমাল হ'য়ে গিয়েছে।

যাই হ'ক কোনোরকমে বললেন—'তাই দিচ্ছি, আপনি ব'লে যান।'

'এবার দুটো লাল আচড় দিন। আচ্ছা, তারপর হালকা নীল— আমার বসবার ঘরের দেয়ালের রঙ দেখেছেন তো, হ্যাঁ, সেই রকম।'

এইভাবে ছবি শেষ হ'ল। শ্রীমতীর জন্মদিনও এসে গেল। আমি সুরঞ্জনকে বললাম—'ওহে পত্রিকাটা বের ক'রে ছবিটা মিলিয়ে দেখা যাক না।'

'বেশ কথা'— ব'লে শ্রীমান তো পত্রিকাটি বের ক'রে ছবিটা মেলাতে বসলেন।

তারপর আর কী? ছবিটা একটুও সে রকম হয় নি।

সেটা ছিল 'চিরহরিৎ বনভূমি' আর এটা শ্রীমতীর ডিরেকশানে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে 'বৃক্ষহীন মরুভূমি'। সুরঞ্জন তো অকূল-পাথারে পড়লেন। শ্রীমতীর জন্মদিন বুঝি রক্ষা হয় না।

আমি তাকে বোঝালাম—'যাও না, এটাই দিয়ে এস। কী আর হয়েছে তাতে। দেখো, কলারসিকার চোখে ঠিক উৎরে যাবে।'

শেষকালে শ্রীমান লজ্জায় আর জন্মদিনের পার্টিতে গেলেন-ই না। লজ্জাতো বটেই। সমবেত নিমন্ত্রিতেরা উৎসুক হ'য়ে থাকবেন সেই ছবিটার মতো ছবি দেখতে। এবং কাজে-কাজেই এই ছবি নিয়ে কলারসিক বন্ধুত্ব শেষ হ'ল।

তারপর দীর্ঘদিনের বিরতি। সুরঞ্জনের এক আর্ট একজিবিশনে শ্রীমতী জয়জয়ন্তী এসেছেন। হঠাৎ তিনি শিল্পীর 'বৃক্ষহীন মরুভূমি' ছবিটি দেখে উচ্ছ্বাসিত হ'য়ে উঠলেন :

'এ-ছবিটা তো বেশ হয়েছে। আপনার এমন ছবি একটাও হয় নি। আমি এটা কিনব।'

ছবিটা আগেই বিক্রি হ'য়ে গিয়েছিল। সুরঞ্জন তাই বললেন—'অন্য কোনো একটা কিনুন। এটা তো বিক্রি হ'য়ে গেছে।'

জয়জয়ন্তী বললেন—'না, এটাই আমার চাই। এটা না-হোক এ-রকমই একটা এঁকে দিন না। কবে দেবেন বলুন? প্লিজ।'

সুরঞ্জন মাথা নিচু করলেন। এবার আর কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না।

হিন্দু কলেজের কথা : রিচার্ডসন

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব কলেজের প্রফেসর পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রিন্সিপল হয়েন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাত গমন করেন। তিনি সদ্বিদ্যাশালী সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রদিগকে ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত যত্ন ছিল। তিনি অতি সুন্দররূপে সেক্সপিয়র বুঝাইয়া দিতে পারিতেন ও অতি মনোহররূপে সেক্সপিয়র আবৃত্তি করিতেন। মেকলে সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "I can forget everything of India, but I can never forget your reading of Shakespeare" "বিলাতে যাইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় ভুলিতে পারি, কিন্তু তুমি যেমন করিয়া সেক্সপিয়র পাঠ কর তাহা কখন ভুলিতে পারিব না।" রিচার্ডসন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাজি সাহিত্যের মর্মজ্ঞ করিতে ও তাহাদিগের মনে তদ্বিষয়ে সুরুচি উৎপাদন করিতে তিনি যেমন পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বালকদিগের সহিত কাপ্তেন সাহেবের বিলক্ষণ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্যন্ত চলিত। কোন ছাত্র "Amiss" এ শব্দকে "য়্যামিস" না বলিয়া "এমিস" বলিয়া উচ্চারণ করিলে তিনি তাহাকে বলিতেন, "You are a miss." সে বালক লজ্জায় আর এরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিত না।

রাজনারায়ণ বসু : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (শক ১৭৯৭)

পুস্তক পরিচিতি

দিক-বিদিক ॥ ডঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ মিত্রালয় ॥ সাড়ে তিন টাকা ॥

ভ্রমণের নেশা বড় নেশা। একবার সে-নেশায় যে মজেছে তার আর পরিত্রাণ নেই। তাকে ভুবন ভ'রে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমাদের সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর ভবঘুরে-বৃত্তি আছে। কেউ তার জোরে দিক-বিদিকে ঘুরে বেড়ায়, কেউ-বা ঘরে ব'সে রেলের টাইম-টেবিল, গাইড-বুক আর ভ্রমণকাহিনী প'ড়ে আশ মেটায়।

ভ্রমণকাহিনী শেষোক্তদের জন্য। ভ্রমণের স্বাদটি বজায় রাখা সহজ কর্ম নয়। ভ্রমণ-কাহিনীর অর্থ অনেকের কাছে ভ্রমণ ও কাহিনী, আরো স্পষ্ট ক'রে বললে ভ্রমণপ্রণয়-কাহিনী। আবার কারো কাছে তা পাণ্ডিত্য দেখানোর ক্ষেত্র, ইতিহাসের নীরস গবেষণার আঁধিতে তা পাঠকের দৃষ্টিরোধ করে।

সুখের বিষয় "দিক-বিদিক" বইখানি সত্যি ভ্রমণ-গ্রন্থ। নিভেজাল ভ্রমণসুখের আনন্দ এর পাতায়-পাতায় ছড়ানো। পাঠককে লেখক সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান, আনন্দ দেন।

প্রথম রচনাটিতেই তার প্রমাণ পাই। সূচনাটি এইরূপ :

"কাস্টমস্ ছাড় পেয়ে যখন জেটিতে এসে পৌঁছলুম তখন ষ্টীমার খুলতে আর বেশী দেরী নেই— ইতিমধ্যেই প্রথম ঘণ্টা প'ড়ে গেছে। চারদিকে লোকের ছোটাছুটি— শেষ-মুহূর্তের সকল ব্যস্ততা।···চাইলুম এমন দরদ দিয়ে জাহাজটার দিকে, কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই এতটুকু। আপনার মেজাজে দিব্যি একখানা ম্যাগনাম সাইজের বর্মা চুরুট ধরিয়ে ভুক-ভুক ক'রে সারা আকাশটায় জমকালো ক'রে ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। আমি তো দেখে একেবারে থ'।"

এই লঘু ঘরোয়া পরিহাসের ভঙ্গিতে বইটি লেখা। লেখকের মন ছুটে চলেছে, বর্ণনাও ছুটেছে, সেই সঙ্গে পাঠকমনও দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। দশটি রচনা— 'নীলসাগরের ঢেউ', 'এ-উজ্জয়িনী সে-উজ্জয়িনী নয়', 'সেইন নদীর ধারে', 'প্রবাল দ্বীপে', 'কাঠের জুতোর তাজ্জব দেশে', 'পশ্চিমী', 'রূপকাহিনীর তেপান্তরে', 'ভারতের শেষ তীর', 'মনসা মথুরা', 'কলকাতার অদূরে' এই গ্রন্থে রয়েছে। সব কটিই তাজা প্রাণমাতানো ও ফুর্তিলা।

ইয়োরোপে দেশে-দেশে সমুদ্রবন্দরে নদীতীরে, সহরে-গ্রামে লেখক ঘুরে বেড়িয়েছেন, আবার উজ্জয়িনী, দ্বারকা পরিক্রমাশেষে মাতলা, মাকড়দা বলাগড় বাঁশবেড়ে ক্যানিং বাহিরগড়া ঘুরে এসেছেন। দূরে ও কাছে, দেশে ও বিদেশে এই জীবনরসিক লেখক ভ্রমণের আনন্দ-সন্ধানে বেরিয়েছেন। দিকবিদিকে তাঁর মৃগয়া ব্যর্থ হয় নি, এই বই তার প্রমাণ। কর্মব্যস্ততার মাঝে এই বই পড়লে কর্মপাশবদ্ধ মন একবার বিশ্বের আনন্দলোকে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়। এখানেই বইটির সার্থকতা।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

লেখক-পাঠকের প্রতি

শুভার্থীদের সব আশা ধূলিসাৎ ক'রে আমরা আবার প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার নতুন সংখ্যা আপনার কাছে হাজির করলাম। জিনিসটা আপনি নেড়ে-চেড়ে দেখবেন, এ-দুরাশা অনেক চেষ্টা ক'রেও ত্যাগ করতে পারছি না। আশ্বাস দিচ্ছি, কাগজের মান অক্ষুণ্ণ আছে— উনোন আগের মতোই ধরানো যাবে (পরীক্ষা প্রার্থনীয়)। আর লেখার মান ? অপ্রিয় হওয়ার ভয় সত্ত্বেও জানাচ্ছি লেখেন আপনি-ই। অথবা লেখেন না— বহু তাগাদা, নোটিশ এবং জুতোর তলদেশ খরচ ক'রে লেখাতে হয়। বিপরীত পক্ষে, সুবিধার্থে মাঝে-মাঝে ব'লেও দেন যে আপনার লেখাটা মোটামুটি ভালো-ই হয়েছে। সম্পাদক তো নিমিত্তমাত্র !

আপনাকে ভয়ে-ভয়ে জানাচ্ছি যে প্রেসিডেন্সি কলেজ পাল্টাচ্ছে— অর্থাৎ আপনি এবং আপনার বন্ধুরা বদলাচ্ছেন ; আপনার কলেজের দালান ও মাঠ, শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রীদের মোট সংখ্যা এবং কলেজে তাঁদের উপস্থিতির অনুপাত সব-ই বদলাচ্ছে। এ-কথাটা খুব-ই সাধারণ হয়তো তবে এটা মনে রাখলে আপনি হঠাৎ প্রাক্-পরিবর্তন কলেজের মাপকাঠিটা আমাদের উপর ব্যবহার করবেন না। সম্পাদক হিসেবে এ-কলেজের পুরনো পত্রিকাগুলোর সঙ্গে অল্পবিস্তর আলাপ হ'ল— একটা সূক্ষ্ম তফাৎ আমরা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল নিশ্চয়ই আগের থেকে পড়াশুনো অনেক বেশী করছেন কারণ তাঁরা আজকাল ক্রমশই বেশী ক'রে কম লিখছেন। এবং ক্লাশে-ক্লাশে, কক্ষে-কক্ষান্তরে কি সাহিত্য-চিন্তা ও সৃষ্টির বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভ হয়েছে ? মনে হয় তাই-ই, নইলে পত্রিকা থেকে ক্রমে-ক্রমে কল্পনাধর্মী ইতিহাস-মূলক প্রবন্ধ, নাটক ও গল্পের পুরোপুরি অন্তর্ধান আর কী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ? লেখনীশক্তি যে অনেক গভীরতর হয়েছে আগের থেকে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ; এবং আমরাও গল্প কবিতা নাটক প'ড়ে থাকি— মাঝে-মাঝে ভালো লেগেছে এ-রকম একটা দাবিও ক'রে ফেলি। সুতরাং অবধারিত সিদ্ধান্ত হয় যে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার জন্য আপনি আর লিখতে চান না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের আর-একটি বিশেষত্বের কথা জানাচ্ছি। তা এই যে, এখানকার কোনো-কোনো ছাত্র-ছাত্রী এখনো পাঠ্যপুস্তকের বাইরে অনেক জিনিস নিয়ে পড়াশুনো

করেন (প্রভূত পরিমাণে আড্ডা দেওয়া সত্ত্বেও)— বোঝার চেষ্টা করেন— এবং আপনি কৌতুক বোধ করতে পাবেন— এই পড়াশুনো তাদের ওপর প্রভাববিস্তারও করে। তবে পড়াশুনো যে কষ্টকর তাতে সন্দেহ নেই। এবং সাধ্যাতিরিক্ত বিষয় খুঁজতে গেলে বিমূর্ত ধারণা এবং সামান্য মানবিক সত্য ছাড়া এ-যুগে অন্য মনোগ্রাহী অনুসন্ধানকার্য দুষ্প্রাপ্য।

আন্দাজ করতে পারছি আপনি প্রশ্ন করবেন যে ওসব বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো কেন। আর এখানেই আমরা আপনাকে পরের খবরটি জানাচ্ছি যে যাঁদের কথা বললাম তাঁরা কেউ-ই জিনিয়াস নন আর এ-ধরনের জীব এ-কলেজেই এখানে-ওখানে দু-চারটে ছড়িয়ে থাকা সম্ভব। আপনি যদি তৎপর হন, তবে দু-চার বছরের মধ্যে এঁরাও এই কলেজের সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাসের অংশ-বিশেষ হ'য়ে যাবেন।

আমরা কিন্তু কোনো তুলনামূলক নিন্দা-প্রশংসায় প্রবৃত্ত নই— কী ছিল, কী আছে এবং কী হ'তে পারে তারই একটা খসড়া হাজির করার চেষ্টা করছি। আমরা আপনাদেরই একজন— স্থানবিশেষের সুবিধায় আগে জানতে পেরে এখন আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি আর আগের মতো নেই, এই মাত্র। আপনি কফি হাউসে যান, আগেও যেতেন; আপনি আড্ডা মারেন, আগেও মারতেন; আগে বোধ হয় একটু কল্পনাপ্রবণ ছিলেন, এখন একটু বাস্তব হয়েছেন— আগে শুধু খেলার মাঠেই চেঁচাতেন, এখন ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে নিমন্ত্রিতা মহিলা-বক্তার ভাষণের সামনেও গলা ছাড়েন। এই প্রসঙ্গেই আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার গোষ্ঠীতে দু-চারটি যূথভ্রষ্ট বিপথগামী এখনো থাকা সম্ভব। এখন, আপনার পত্রিকা যেমন আপনারই হাতে, আপনি ইচ্ছে করলে বছরে দু-বারও বেরোতে পারে, না-ও বেরোতে পারে— তেমনি এঁদের নিয়ে আপনি কী করবেন তা-ও আপনারই দায়িত্ব— আপনারই মূল্যায়নের উপর নির্ভর করছে। আমাদের কিছু কৌতূহল রয়েছে, তাই ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছ থেকে জানার আশায় উদগ্রীব হ'য়ে থাকব, আপনি কী সিদ্ধান্ত করলেন। আপনার উপরে ভারতবর্ষ, তথা এশিয়া-র একটি শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ের ভবিষৎ রূপ নির্ভর করছে। প্রকৃত পক্ষে রূপটা কী হবে এবং তা ভালো, না মন্দ সে-বিচার করতে আমরা অপারগ। আপনি কফি হাউসে আগের মতো মাঝে-মাঝে একাও যাবেন কিনা, আপনার আড্ডার বিষয়বস্তু আগের মতো বিচিত্র হবে কিনা, আপনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হার্ভার্ডে যাবেন, না M.I.T. যাবেন—ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে তার নির্ধারক মাত্র দুটিই: আপনার ইচ্ছা ও আপনার ক্ষমতা।

আমাদের কথা

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে নবশিক্ষা-প্রবর্তনের প্রথম যুগে স্থাপিত হয়েছিল আমাদের এই কলেজ। তখন এর নাম ছিল হিন্দু কলেজ। নবযুগের আদর্শ বহন করার গুরু দায়িত্ব নিয়ে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশীয় মনীষীর উদ্যোগে এই কলেজ স্থাপিত হয়। এই মনীষীদের মধ্যে ছিলেন ভারতহিতৈষী ডেভিড হেয়ার, বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর, গোপীমোহন ঠাকুর, রাজা গোপীমোহন দেব, বৈদ্যনাথ মুখার্জি, সার এডওয়ার্ড হাডহ ঈস্ট, জোসেফ ব্যারোটো, জে. এইচ. হ্যারিংটন, লেঃ-কর্ণেল ফ্রান্সিস আরভিন প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তি। রাজা রামমোহন ছিলেন এর আদি কল্পক। আজ ১৪৬ বৎসর পূর্বের সেই কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাব্রতীদের আমরা বিনম্রচিত্তে স্মরণ করি।

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয়, তখন যত আন্দোলন এবং সমালোচনাই হ'য়ে থাক না কেন, আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এই রূপান্তরণ ছিল মহৎ আদর্শেরই প্রসারণ। কলেজের ইতিহাসে প্রতি পর্যায়েই যুগ ও জীবন যথাযথরূপে প্রতিফলিত হ'য়ে আসছে।

আজকের এই উৎসবের আদিতেই ভারতের সাম্প্রতিকতম জাতীয় সংকটের প্রসঙ্গ অপরিহার্য। ভারতের উত্তর সীমান্তে চীনা আক্রমণ আমাদের স্তম্ভিত করেছে। ছাত্র, শিক্ষক ও বিদ্যায়তনের সকল সেবকের ধিক্‌কারে এ-বর্বরতা তিরস্কৃত। সকলের সম্মিলিত উৎসাহে প্রতিরক্ষা তহবিলে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে কলেজ ও কলেজের ছাত্রাবাস থেকে এ-পর্যন্ত একাধিক কিস্তিতে প্রায় সাত হাজার টাকা এবং ১৯টি স্বর্ণালংকার দেওয়া হয়েছে, আরো দেবার প্রচেষ্টা চলছে। তা ছাড়া, রক্তদান, রাইফেল-চালনা শিক্ষা, প্রাথমিক শুশ্রূষা শিক্ষা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অন্যান্য আয়োজনও শুরু হয়েছে।

মহত্তর গৌরবের অভিমুখে এই বিদ্যায়তনের নিরন্তর যাত্রা আমাদের নিত্য গর্বের বিষয়। বাঙলা ও ভারতবর্ষের জ্ঞানী ও গুণী, নেতা ও কর্মী— যাদের অনেকেরই ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়েছে এই বিদ্যাভূমিতে, তাঁদের সঙ্গে আজকের ছাত্রদের আত্মিক যোগ-অনুভবের সাধনা সার্থক হ'ক।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফল

কলেজের ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে মোট ১,৫৭২। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ৪৯৭। ১৯০ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সরকারী বৃত্তি পেয়েছে। অসচ্ছল অথচ মেধাবী ৪০০ এবং উদ্বাস্তু ৪ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে পড়াশুনো করছে। এ ছাড়া ৮ জন ছাত্রকে 'জগদীশ বোস ন্যাশনাল সায়ান্স ট্যালেন্ট সার্চ' বৃত্তি দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের মান অক্ষুণ্ণ আছে। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান পরীক্ষায় মোট পাশের হার শতকরা ১০০ এবং ৯৭·৪। তার মধ্যে কলা বিভাগের ৫ জন এবং বিজ্ঞান বিভাগের ৫৬ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বি এ এবং বি এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের পাসের হার ৮৮·৯ এবং ৮১·৮ যথাক্রমে— মোট সংখ্যা ১১৩ এবং ১১৭। বি এ পরীক্ষায় ১৫ জন প্রথম শ্রেণীতে এবং বি এস-সি পরীক্ষায় ৩০ জন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অধ্যাপকমণ্ডলীর পরিবর্তন ও অন্যান্য সংবাদ

ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় ডিসেম্বর মাসে দীর্ঘ সরকারী কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্যে ও জনপ্রিয় অধ্যাপকরূপে তিনি ছিলেন সকলের সুপরিচিত।

অর্থনীতি বিভাগের ডক্টর ভবতোষ দত্ত গত অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তারূপে কার্যভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর শূন্যপদে হুগলি মহসীন কলেজ থেকে এসেছেন শ্রীদীপ্তিভূষণ দত্ত। এই বিভাগের ডক্টর তাপস মজুমদার লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ এক বৎসরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হ'য়ে চ'লে গিয়েছেন। শ্রীঅশোক সেন গত জুলাই মাসে সহকারী অধ্যাপকরূপে যোগ দেন, কিন্তু মে মাসেই তিনি ভারতীয় শাসন বিভাগীয় কাজে নিযুক্ত হওয়ায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। শ্রী বি. এন. জালান তাঁর জায়গায় কয়েক মাস কাজ করেন।

ইংরেজী বিভাগের ডক্টর শৈলেন সেন দার্জিলিঙ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি পুনরায় এই কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে যোগদান করেছেন। শ্রীমতী শান্তা মহলানবীশ সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন। তিনি লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে বদলির আদেশ পেয়েছেন। এই বিভাগের শ্রীপ্রবীর সরকার উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বর্তমান কর্ম ত্যাগ করেছেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বদলি হ'য়ে এসেছেন। এই বিভাগের অন্যতম সহকারী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে প্রক্টর-পদে যোগদানের আদেশ পেয়েছেন।

বাংলা বিভাগের শ্রীহরনাথ পালের জায়গায় এসেছেন মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে শ্রীশ্যামল চট্টোপাধ্যায়। বাংলা বিভাগের নবসৃষ্ট পদে হুগলি মহসীন কলেজ থেকে এসেছেন ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক। দর্শন বিভাগের বিভাগীয় অধ্যক্ষরূপে শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। এই বিভাগের দু-জন সহকারী অধ্যাপক এসেছেন ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী এবং ডক্টর দেবব্রত সিংহ।

রসায়ন বিভাগের ডক্টর এস. সি. সোম আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন। ডক্টর কিরণচন্দ্র সেন অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছেন। শ্রীমুকুলচন্দ্র দাস এবং শ্রীসরোজকুমার চক্রবর্তী সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। ডক্টর এস. কে. ঘোষ দীর্ঘকাল পর আবার সহকারী অধ্যাপকপদে যোগ দিয়েছেন। শ্রী এস. এন. চক্রবর্তী ঝাড়গ্রাম কলেজ থেকে সহকারী অধ্যাপকপদে যোগ দিয়েছেন। শ্রীজগদীশচন্দ্র সরকার ঝাড়গ্রাম গিয়েছেন। শ্রী এস. কে. রায় পদত্যাগ করেছেন এবং শ্রী এ. কে. মিত্র ও শ্রী এ. বি. পাণিগ্রাহী লেকচারার-পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগে ডক্টর এফ. সি. দত্ত পদত্যাগ করেছেন। শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায় লেকচারার-পদে যোগ দিয়েছেন। ভূতত্ত্ব বিভাগে ডক্টর এ. কে. সাহা অধ্যাপকপদে উন্নীত হয়েছেন। ডক্টর পি. কে. গাঙ্গুলী সহকারী অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হয়েছেন। শারীরতত্ত্ব বিভাগে শ্রীমতী অণিমা দত্ত লেকচারার নিযুক্ত হ'য়ে এসেছেন। ডক্টর রবীন্দ্রনাথ সেন পদত্যাগ ক'রে অন্যত্র কাজে যোগ দিয়েছেন। শ্রীআশিসকুমার সিংহ ডেমনষ্ট্রেটর-পদে নিযুক্ত হ'য়ে এসেছেন। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগে ডক্টর অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন। ডক্টর অশোক বসু পদত্যাগ করেছেন। ভূগোল বিভাগের শ্রীতরুণকান্তি লাহিড়ী সিটি মেট্রপলিটন প্ল্যানিং অগানাইজেশন-এ যোগ দিয়েছেন— তিনি চন্দননগর কলেজ থেকে বদলি হ'য়ে এসেছিলেন। তার শূন্যপদে এসেছেন শ্রীসত্যকাম সেন। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই বিভাগে জুনিয়র ডেমনষ্ট্রেটর-পদে যোগ দিয়েছেন। পরিসংখ্যান বিভাগের পরিবর্তন কিছু বেশি। শ্রীঅতীন্দ্র-মোহন গুণ এবং শ্রীমলনকুমার গুপ্ত উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছুটিতে গিয়েছেন। শ্রীবিভাসরঞ্জন দে সহকারী অধ্যাপকপদে উন্নীত হওয়ায় তার জায়গায় লেকচারার-পদে এসেছেন শ্রী এস. পি. মুখোপাধ্যায়। শ্রী ডি. কারফরমার নবসৃষ্ট লেকচারার-পদে নিযুক্ত হলেন। শ্রী এ. চৌধুরী পদত্যাগ করায় তার জায়গায় শ্রী পি. কে. সাধু জুনিয়র ডেমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রী টি. পি. বসু পদত্যাগ করায় শ্রী এম. কে. বসু দ্বিতীয় জুনিয়র ডেমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত হয়েছেন।

পদার্থবিজ্ঞানে শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তী এবং ডক্টর মদনগোপাল বসাক যথাক্রমে দার্জিলিঙ সরকারী

কলেজ এবং ঝাড়গ্রাম রাজকলেজ থেকে সহকারী অধ্যাপকপদে যোগ দিয়েছেন। শ্রীরমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীভূপাল সামন্ত, শ্রীসনৎকুমার ঘোষ এবং শ্রীরথীন্দ্র দে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীভূপাল সামন্ত পুনর্বার হুগলি কলেজে বদলি হয়েছেন। শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র বিদেশ থেকে এসে শূন্যপদে যোগ দিয়েছেন। শ্রীতরুণ ভট্টাচার্য জুনিয়র ডেমনস্ট্রেটর-পদ ত্যাগ করেছেন উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রার জন্য। শ্রীক্ষেত্রধন ভট্টাচার্য সেই পদে উন্নীত হয়েছেন। শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য সম্প্রতি তাঁর শূন্যপদে নিযুক্ত হয়েছেন।

কলেজ আফিসের সেকেণ্ড ক্লার্ক শ্রীনরেন্দ্রকুমার হোমচৌধুরী বদলি হওয়াতে তাঁর জায়গায় শ্রীমনোরঞ্জন মিত্র অস্থায়ীভাবে কাজ করছেন। শ্রীমনোরঞ্জন মিত্রের স্থলে শ্রীসমরকুমার চক্রবর্তী নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বদলি হওয়ায় তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীআজতকুমার দাস। অস্থায়ী টাইপিস্ট শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যকাল শেষ হওয়াতে সেই পদে শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সরকার নিযুক্ত হয়েছেন। কলেজের পিয়ন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস কাযরত অবস্থায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান। তিনি দীর্ঘ তের বৎসরেরও অধিককাল এই কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকবৃন্দের বিদেশযাত্রা ও অন্যতর নানা নিয়োগ ও গবেষণা

উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগের শ্রীনন্দকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং রসায়ন বিভাগের শ্রী জে. দাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধি লাভ করেছেন। ইংরেজী বিভাগের শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. উপাধি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকদের অধীনে গবেষণা করছেন, এমন ছাত্রের সংখ্যা কম নয়।

অর্থনীতি বিভাগের শ্রীতাপস মজুমদার এক বৎসরের জন্য লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ-এ ডেপুটেশনে গিয়েছেন। পরিসংখ্যান বিভাগের শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুণ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রা করেছেন। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় অল ইণ্ডিয়া ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি এই বৎসর মৌলিক কাজের জন্য 'দোরাবজি টাটা সুবর্ণ পদক' পেয়েছেন। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের শ্রীসোমেশ সান্যাল ইণ্ডিয়ান সায়ান্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন-এ 'মেঘনাদ সাহা' পুরস্কার পেয়েছেন।

আমাদের কলেজের অধ্যাপকগণ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরীক্ষার, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্নমেণ্টের নানা সংস্থায় নানাভাবে যুক্ত আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কলেজের অধ্যাপকদের নানা গবেষণা-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে ভূগোল বিভাগের ডক্টর নিশীথরঞ্জন কর গত মে মাসে সামার স্কুল অফ জিওগ্রাফি-তে যোগদান করেন। তিনি আথনাতিক ভূগোল বিভাগে প্রবন্ধ পড়েন। জিওগ্রাফিক্যাল এক্সপ্লোরেশন ইন দি হিমালয়স বিভাগে তিনি সভাপতিত্ব করেন। পদার্থতত্ত্বের শ্রীসমীরকুমার ঘোষ সম্প্রতি উচ্চতর শিক্ষার জন্য পশ্চিম জার্মানী গিয়েছেন।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও সেমিনার

প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুপ্রচুর ব্যবস্থা আছে। বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানের ছাত্রদের এই ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বেশি। এর দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে আপন-আপন বিষয়ের প্রতি কৌতূহলের সঞ্চার হয় এবং কলেজীয় শিক্ষা সম্পূর্ণতর হয়। ভূতত্ত্ব, ভাস্তদতত্ত্ব ও ভূগোলে শিক্ষাদানের অঙ্গ হিসেবেই বাৎসরিক বহির্যাত্রার ব্যবস্থা করা হ'য়ে থাকে।

ভূতত্ত্ব বিভাগ থেকে এবার চারটি বহির্যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। চিতোরগড় চিরিমিরি, কোডারমা এবং আসানসোলে ভ্রমণ পরিচালিত হয়। উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগে তিনটি বহির্যাত্রা এবং ত্রিশটি স্থানীয় শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছে। ছাত্রেরা পশ্চিম হিমালয়ে সিকিমে, পূর্ব হিমালয়ে এবং তৃতীয়ত উড়িষ্যায় গিয়েছে। ভূগোলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রেরা সিমলায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শোণ উপত্যকা, বিন্ধ্য পর্বত, গয়া, রাজগীর এবং নালন্দায় গিয়েছিল। প্রাণিতত্ত্বের ছাত্রদের এবার দাক্ষণ ভারতে যাবার কথা। পরিসংখ্যানের ছাত্রেরা স্টেট স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং বর্ধমানে স্টেট এগ্রিকালচারাল ফার্মে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য গিয়েছে।

বিভিন্ন বিভাগের সেমিনারে সারা বছরই সুপরিচিত পণ্ডিতদের দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ানো হ'য়ে থাকে। ছাত্রেরা নিজেরাও এখানে আলোচনা ক'রে থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগে ব্রিটিশ মিউজিয়ম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির এ. এইচ. নরথেত, ইণ্টারন্যাশনাল রাইস ওয়ার্কিং পার্টি এবং যুক্তরাষ্ট্রের পি. এল. ৪৮০ সংস্থা পরিদর্শনে আসেন।

গ্রন্থাগার

১৯৬২ সালের ২৬শে নভেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা ছিল ৯২,১৩৮ এবং বাঁধানো পত্রিকার সংখ্যা ছিল ১৪,১০৭। ১৯৬১-৬২ সালের কেনা বই ও পত্রিকার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,৫১০ ও ১১৮। এর জন্য মোট খরচের পরিমাণ ৮১,৭২৫·৭২ টাকা (এর মধ্যে ৬৮,৯০০ টাকা 'ডেভেলপমেণ্ট গ্রাণ্ট' হিসেবে পাওয়া যায়)। আলোচ্য বর্ষে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান -বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বই রাখার জন্য ১০,০০০ টাকায় ২৪টি আলমারি কেনা হয়। এ ছাড়া আলোচ্য বর্ষে ২৮৫ খানি বই, পত্রিকা ও পুস্তিকা উপহার-স্বরূপ পাওয়া গেছে। আলোচ্য বর্ষে বরাদ্দ ১৮,০০০ টাকায় ৬,৫৫৬ খানি বই ও পত্রিকা বাধানো হয়েছে। বহুদিন যাবৎ আবেদন-নিবেদন ক'রে বিভিন্ন বিষয়ে অতিরিক্ত পত্রিকা কেনবার জন্য ৬,২১৭·৬২ টাকা পাওয়া গেছে।

১৯৬১-৬২ সালে মোট ৯৭,৪২০ খানি বই ব্যবহৃত হয়েছে— বাড়িতে ব্যবহারের জন্য ৩৬,৮৫০ খানি এবং বিভিন্ন সেমিনারে ব্যবহারের জন্য ৩,৪৪০ খানি।

থ্রি-ইয়ার ডিগ্রী কোর্স, প্রি-ইউনিভার্সিটি ও প্রি-মেডিক্যাল ক্লাস এই কলেজে প্রবর্তিত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এবং গ্রন্থাগারের কাজ দুই-ই প্রচুর বেড়ে গেছে। অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার আবেদন করা হয়েছে ; এখনও কোনো ফল হয় নি।

পাঠক-পাঠিকাদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে সকলে, সন্ধ্যায় ও ছুটির দিনে গ্রন্থাগার খোলা রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট অতিরিক্ত কর্মচারী ও বই, আলমারি ও শেলফ ঝাড়পোঁছ করার জন্য দু'টি ফরাস গত ১০ বছর ধ'রে চাওয়া হচ্ছে ; এখন পর্যন্ত কোনো ফল হয় নি। এ-ছাড়া গ্রন্থাগারে ক্রমবর্ধমান কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটি অতিরিক্ত কর্মচারী (যেমন ডেপ-গ্রন্থাগারিক, অতিরিক্ত তালিকা-প্রণেতা, অতিরিক্ত সহকারী গ্রন্থাগারিক, আতারক্ত বেয়ারা, দ্বাররক্ষক ইত্যাদি) চাওয়া হয়েছে— এখনও কোনো ফল পাওয়া যায় নি।

'পে-কমিটি রিপোর্ট'-অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের বেতনহার সামান্য বৃদ্ধিলাভ করেছে (অবশ্য আমাদের প্রস্তাবিত বেতন-হারের অনুরূপ নয়— বিশেষত তালিকা-প্রণেতার বেতনহার হতাশাজনক), দুঃখের বিষয় সহকারী গ্রন্থাগারিকেরা নবনির্ধারিত বেতন আজ পর্যন্ত পান নি, যদিও ঐ রিপোর্ট প্রকাশের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হ'য়ে গেছে। এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারে বই রাখার গুরুতর স্থানাভাব পূর্ববৎ। অতিরিক্ত র‍্যাক স্থাপন করা, অতিরিক্ত আলোর বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এখনও কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় নি।

আমাদের কয়েকজন স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী বাংলা বিভাগের গ্রন্থতালিকার নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরি

ক'রে দিয়ে কলেজের প্রতি তাদের আন্তরিক মমতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অনুরাগের কথা সমাদরের সঙ্গে উল্লেখ করা হ'ল।

ভারত-সরকারের আবেদনক্রমে সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাগারের অপ্রয়োজনীয় পুরাতন পত্রিকাদি মাঝে-মাঝে জাতীয় গ্রন্থাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্রসংসদ

অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও ছাত্রদের কাজে অব্যাহত উদ্দীপনা দেখা গেছে। প্রতিষ্ঠাতৃদিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান-সূচির মধ্যে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং একটি ইংরেজী নাটক 'নেপোলিয়ন অ্যাণ্ড দি ট্রাম্প' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রদর্শনী বিতর্কসভা ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়।

খড়্গপুর ইনস্টিটিউটে আয়োজিত আন্তঃকলেজ নাটক-প্রতিযোগিতায় উপরি-উক্ত ইংরেজী নাটকটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। অগস্ট মাসে ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে দু'টি ইংরেজী চলচ্চিত্র 'মিসেস কেনেডির ভারত-ভ্রমণ' এবং মার্কিন মহাকাশচারী 'জন গ্লেনের মহাশূন্য পরিভ্রমণ'-এর আয়োজিত হয়েছিল। এ ছাড়া, বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীকুমারেশ ঘোষের 'ম্যানিয়া', রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য 'শ্যামা' এবং একটি ইংরেজী নাটক 'কেইন মিউটিনি' স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

রবীন্দ্র-পরিষদ আয়োজিত এক আলোচনা-সভায় আধুনিক বাংলা নাটকের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞ কয়েকজন অধ্যাপক, আর তাতে যোগ দেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানে বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য। তা ছাড়া এক রবীন্দ্র-সংগীতসভায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীনীলিমা সেন, শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস, শ্রীপূরবী মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। এ-সব অনুষ্ঠান ছাড়া কমন রুমের আভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠান এবং নবাগত ছাত্রসংবর্ধনার আয়োজনও যথারীতি হয়েছে।

অক্টোবর মাসে ভারতের সীমান্তে চীনের আক্রমণের জন্য ছাত্রসংসদের সমস্ত আমোদপ্রমোদ অনুষ্ঠানের আকস্মিক বিরতি ঘটে। এই জাতীয় সংকটে ছাত্রসমাজও সর্বতোভাবে জাগ্রত হয়েছে। অর্থ, বল, রক্ত প্রভৃতি সবকিছু দিয়েই মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ছাত্রসংসদ উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে।

কলেজের ছাত্রাবাস

কলেজের ছাত্রাবাস দু'টি—প্রাক্-স্নাতক ছাত্রদের জন্য ইডেন হিন্দু হোস্টেল এবং স্নাতকোত্তর ছাত্রদের জন্য অন্য একটি ছাত্রাবাস আছে। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের এই ছাত্রাবাসটি নানা কারণে অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়া দরকার। উচ্চপাঠরত বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের সুযোগসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে এ-বিষয়ে উপযুক্ত সংস্কারসাধনের উদ্যোগ চলছে। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে অসচ্ছল অথচ মেধাবী আবাসিক ছাত্রদের সাহায্যদানের জন্য ছাত্রদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান গ্রহণ ক'রে একটি পৃথক তহবিল খোলা হয়েছে এবং আবাসিক ছাত্রেরা তা থেকে সাহায্যও পাচ্ছে। তা ছাড়া, একটি টেক্সট-বুক লাইব্রেরিও খোলা হয়েছে—সে-ও ছাত্রদের নিজেদের চাঁদায়। গত ৩রা ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকর্তা ডক্টর ভবতোষ দত্ত সেই গ্রন্থাগার উদ্বোধন-সূত্রে ছাত্রাবাসে অনুষ্ঠিত এক সান্ধ্য-সভায় উপস্থিত থেকে ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। সহ-শিক্ষা-অধিকর্তা শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন ছাত্রসংসদ

প্রাক্তন ছাত্রসমিতির কাজ নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে। বৎসরের প্রথমেই নবনির্বাচিত সভাপতি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মৃত্যু শোকের ছায়া বিস্তার করে। ৮৯ জন আজীবন সদস্য নিয়ে সদস্য-সংখ্যা দাঁড়িয়েছে

১,১৫২। ২০শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবসে পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর রঙমহলে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। সংসদের বার্ষিক পত্রিকা ৩য় সংখ্যা ৺পূজার পূর্বে যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে। এ-বৎসরেও কলেজের দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্যকল্পে কয়েকজন সভ্য সংসদে কিছু অর্থ দিয়েছেন। বর্তমানে দেশের যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য সংসদের অধিকাংশ কার্যক্রমই সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। সংসদের পক্ষ হ'তে প্রতিরক্ষা তহবিলে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্কলারশিপ

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অধ্যাপক শ্রী যোগেশচন্দ্র ঘোষ— সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন স্বনামধন্য প্রাক্তন ছাত্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র, এই কলেজের রসায়ন বিভাগের ছাত্রদের জন্য উপরিউক্ত বৃত্তিটির ব্যবস্থা করেছেন। বৃত্তিটির হার হবে মাসে পঁচিশ টাকা। তার এই সহৃদয়তা রসায়নের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর মান অনুসরণে সহায়তা করবে এবং আচার্যের মহান স্মৃতির সঙ্গে তাঁর-ই কলেজের আরো একটি যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল।

বৈদেশিক অতিথি

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রতি বছরই বিদ্যানুরাগী বিভিন্ন বৈদেশিক অতিথি এসে থাকেন। এ বছর গ্রেট ব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া থেকে যারা এসেছিলেন, তাঁদের আংশিক তালিকা এই পুস্তিকায় প্রকাশিত হ'ল।

উপসংহার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবর্ষব্যাপী স্নাতক শিক্ষণের প্রথমাংশের পরীক্ষার্থীদের প্রথম দল এই বছর পরীক্ষা দিয়েছে। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কলা ও বিজ্ঞান এবং প্রাক্-চিকিৎসাশিক্ষণ শ্রেণীর শিক্ষাদান চলছে। উপযুক্ত স্থানসঙ্কুলানের অসুবিধা এখানকার নতুন সমস্যা নয়। ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত কমন রুমের অভাব, কলেজের কলা বিভাগের মূল বাড়িতে যে-সব অধ্যাপক বসেন তাঁদেরও উপযুক্ত জায়গার অভাব, সেমিনার কক্ষগুলিতে ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হয় ব'লে সেগুলির সদ্ব্যবহারে অন্তরায় ইত্যাদি বিভিন্ন অসুবিধা অবিলম্বে দূর হওয়া উচিত। উপসংহারে আরো একটি কথা বলা দরকার। এই কলেজে ছাত্রছাত্রীর বিশেষ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, এখানকার শিক্ষক পদগুলির সমুচিত উন্নয়ন দরকার।

বাংলা পাঠচক্র

একটি সম্পূর্ণ বছর পেরিয়ে আসার পর বৈষয়িক কারণে প্রয়োজন পড়েছে তার ফলশ্রুতি যাচাই ক'রে নেবার। প্রতি মুহূর্তে যখন কাজ করি তখন সেই বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলো যে পরস্পর যুক্ত হ'য়ে কিছু-একটা হ'য়ে-উঠার চেষ্টা করে সে-হিসাব থাকে না। হঠাৎ একদিন অতীতের দিকে নজর পড়ে। নিজেদের অস্তিত্বের আসল চেহারাটা ফুটে ওঠে। বলতে বাধা নেই বাংলা পাঠচক্রের এক বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের অনেক ক্ষেত্রেই আমরা সাধ্যমত কাজ ক'রে উঠতে পারি নি। উপযুক্ত ঘরের অভাব এই অক্ষমতার একটি প্রধান কারণ।

বাংলা পাঠচক্রের গ্রন্থাগারটি সাধ্যমতো সাম্মানিক ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সাম্মানিক পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীদের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে একটি অনুষ্ঠানের

আয়োজন হয়, ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠানটি সার্থক হ'য়ে ওঠে।

গত শ্রাবণ মাসের শেষ দিনটিতে বর্ষামঙ্গল উৎসব ক'রে বর্ষাকে বিদায় জানানো হ'ল। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের আন্তরিক উৎসাহ ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করে। অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতি ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র অনুষ্ঠানের মূল সুরটির সার-সংক্ষেপ বিবৃত করেন।

আমাদের সামনে এখন রয়েছে প্রথম বর্ষের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত জানানো এবং পাঠচক্রের প্রাচীরপত্র আশাবরী-র নবজন্ম ঘটানোর দুরূহ চেষ্টা।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পার্বতী রায়
বাংলা পাঠচক্র

ইতিহাস সেমিনার

১৯৬২-৬৩ সালে ইতিহাস সেমিনার-এর কার্যক্রম কতকগুলি বিশেষ কারণের জন্য সামাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে। সেমিনার কতকগুলি বক্তৃতার আয়োজন করিয়াছে। ডঃ ডি. সি. সরকার -প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ বক্তৃতা দেন। যুগোশ্লাভিয়ার একজন মাননীয় অধ্যাপক শ্লাভ জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলেন। সেমিনার ছাত্রছাত্রীবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছে। নূতন প্রাচীরপত্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথারীতি চতুর্থ ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং নবাগতদের স্বাগতানুষ্ঠান সাফল্যের সহিত আয়োজিত হইয়াছে। সেমিনার লাইব্রেরী হইতে বই-এর আদানপ্রদান সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য
সম্পাদক, ইতিহাস সেমিনার

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেমিনার

বর্তমান বৎসরে আমাদের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থনীতি বিভাগের ডঃ সুখময় চক্রবর্তী অন্যত্র কার্যে যোগদান করেছেন। ডঃ তাপস মজুমদার লণ্ডন থেকে ফিরে এসে বিভাগীয়-প্রধানের (অর্থনীতি) কার্যভার গ্রহণ করেছেন। শ্রী অমিত ভাদুড়ী, শ্রী বিমল জালান এবং শ্রী সঞ্জীব বসু অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে নূতন এসেছেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সেমিনার থেকে চতুর্থ ও তৃতীয় বার্ষিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিদায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা জানাই। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অনেকেই নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকেই এখানে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অগস্ট মাসে টরন্টো ইউনিভার্সিটি থেকে ডঃ নন্দা চৌধুরী এসেছিলেন আমাদের বিভাগে। তিনি Testing the Smithies model on growth and cycles-বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা আমরা খুব আগ্রহসহকারে শুনেছি এবং নূতন তথ্য জানতে পেরেছি।

আমাদের আগামী কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে এই বিভাগে নবাগত ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত সম্ভাষণ জানানো। এবারেও ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা আশা করি।

আমাদের সেমিনার-এর তরফ থেকে কয়েকটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করছি। এই বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রাহান্বিত হবেন আশা করি।

পরিশেষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয়-প্রধান শ্রী উপেন্দ্রনাথ ঘোষালকে ও অধ্যাপকবৃন্দকে আমরা

আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রাত্যহিক কাজে তাঁদের সস্নেহ উৎসাহদানের জন্য। আর ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

বিজয় লাল
সম্পাদক, অর্থনীতি সেমিনার

শম্ভুনাথ নন্দী
সম্পাদক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেমিনার

দর্শন সেমিনার

নতুন ত্রৈবার্ষিক স্নাতকশ্রেণীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য দর্শন পাঠচক্রের বই-এর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। ব্যবহারের অযোগ্য অনেক দরকারী বই বাধিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই পাঠচক্রের উন্নতীকরণ সম্ভব হয়েছে সেমনার-এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নরেশবাবুর আন্তরিক চেষ্টায়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাচালতা প্রকাশ করতে চাইনে।

বিভাগীয় প্রধান-অধ্যাপক পরেশবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবারে দর্শন সেমিনার-এ বহুমুখী উন্নতি ঘটেছে। অনেকদিন ধ'রে 'Seminar Record Book'-এ লেখা বন্ধ ছিল। 'Seminar Record Book' নেতাজীপ্রমুখ এই বিভাগের কৃতী ছাত্রদের দার্শনিক চিন্তার স্বাক্ষর বহন ক'রে আসছে। এবারে নতুন ক'রে 'Seminar Record Book'-এ লেখা আরম্ভ হয়েছে। দর্শনের চিরন্তন সমস্যার সমাধানে ছাত্রেরা যাতে একজন অধ্যাপকের সাহচর্যে তাদের ব্যক্তিগত সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে পারে তার জন্য প্রতি সপ্তাহে এক ঘণ্টা ক'রে আলোচনাচক্র চলে।

এবারে দর্শন সেমিনার-এর তিনটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল :

(১) 'Philosophy and Science'-এর উপর বক্তৃতা দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের Reader শ্রীঅধরচন্দ্র দাস। কীভাবে বিজ্ঞানের মানবধ্বংসী আবিষ্কারকে দর্শনের সর্বদর্শী প্রজ্ঞার দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে লাগানো যেতে পারে এবং সে-দর্শন কী রকম হওয়া উচিত তা তিনি ব্যাখ্যা করেন।

(২) 'Problem of Meaning নিয়ে আলোচনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক Dr. J. N. Mohanty। Meaning কীভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে তার মনোজ্ঞ ও অন্তর্গ্রাহী দার্শনিক ব্যাখ্যা করেন তিনি।

(৩) আমেরিকার একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক Dr. Bahm, 'Philosophy— Eastern and Western', এই বিষয়ের উপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

প্রতি বছরেই দুটি দিন তাদের সামগ্রিক মাধুর্য নিয়ে এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে দেখা দেয়— একদিন তারা তাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের সাথে নতুনদের অভ্যর্থনা জানায়। আর-একদিন জানায় বিদায়ী ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ কামনা ক'রে বিদায় সম্ভাষণ, অধ্যাপকরা তাঁদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের জানান স্নেহাশীর্বাদ ও শুভাশীর্বাদ। শিক্ষক ও ছাত্র, গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক খুবই নিবিড়, তবুও স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান থেকে যায়; কিন্তু এই দুটি দিনে আনন্দ ও মঙ্গলানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ছাত্রেরা তাদের অধ্যাপকদের পরমাত্মীয় বন্ধুরূপেই আবিষ্কার করে— দুয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানও যায় মুছে। তারপর অধ্যাপক ও ছাত্রবন্ধুদের প্রীতি উপহার ফেলে আসা ছাত্রজীবনের মধুরস্মৃতিকে করে মধুরতর, আর অনাগত ভবিষ্যৎকে আশার আলোয় করে সুন্দর।

এবারে আমরা এই কলেজের প্রাক্তন কৃতী-ছাত্র ডঃ দেবব্রত সিংহ মহাশয়কে আমাদের অধ্যাপকদের মাঝে পেয়েছি। তাঁকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সাফল্যের অঙ্কটা বেশ ভারী হ'লেও ব্যর্থতার বেলায়ও শুধু শূন্য নয়। ব্যর্থতার হিসেব দিতে গিয়ে আমার অক্ষমতা ধরা প'ড়ে যায়। এক বছর কয়েক মাসের মধ্যেও আমাদের দেয়াল পত্রিকা *Weltanschauung*-এ নতুন লেখা বের করতে পারি নি। দুবছর আগে যে-লেখাটি তাতে বেরিয়েছিল ক্ষীণ কণ্ঠে সদর্পে সে এই অক্ষমতার কথাই ঘোষণা করে।

তবুও যে-প্রচেষ্টাটুকু কাজে পরিণত হয়েছে, তাতে বন্ধুবান্ধবদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতের কাছে রইল আশা আর আশ্বাস।

সমীরসুধা বিশ্বাস
সম্পাদক, দর্শন সেমিনার

ভূজ্ঞান (বা ভূগোল) পরিষদ

অন্যান্য বৎসরের মতো এবারেও ভূজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের নিয়ে। ১৯৬২-৬৩ সালে পরিষদের কার্যকরী সমিতি এঁদের নিয়ে গঠিত হয় :

সভাপতি : ডক্টর নিশীথরঞ্জন কর
সহ-সভাপতি : ডক্টর অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়
ও
অধ্যাপক সত্যব্রত গোস্বামী
কোষাধ্যক্ষ : ডক্টর সত্যকাম সেন
সহ-কোষাধ্যক্ষ : সাহিদুল হক্
গ্রন্থাগারিক : ডক্টর সত্যেশ চক্রবর্তী
সহ-গ্রন্থাগারিক : গৌরী ঘোষ
যুগ্ম-সম্পাদক : চন্দ্রাবলী রায়
ও
অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোকচিত্র প্রদর্শনীর (Photo Corner) ভার গ্রহণ করেন শেফালী সেনগুপ্ত ও মানসী সেন এবং প্রাচীর-পত্রিকার (পরিক্রমা ও Traverse) সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন মীরা দাস ও সুহৃদ দত্ত।

চব্বিশে জানুয়ারী ১৯৬৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হ'ল আমাদের পুনর্মিলন উৎসব—নব পরিবেশে, মধ্যমগ্রামের একটি বাগানবাড়িতে। সভাটিতে বিহারের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের উপর রঙিন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। উনত্রিশে মার্চ একটি বিশেষ সভায় খড়্গপুর আই. আই. টি-র অধ্যাপক শ্রীদীপংকর নিয়োগী 'Aerial photo-interpretation & its application in geographic research'-এর ওপর পরিষদ-কক্ষে বক্তৃতা করেন।

গত উনত্রিশে এপ্রিল পরিষদে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নর্টন গিনস্‌বার্গ-এর আগমন ঘটে। তাঁকে পরিষদকক্ষে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। এই উপলক্ষে তিনি তাঁর বক্তৃতায় 'Approach & Methods of Geography' বিবৃত করেন।

আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানটি হচ্ছে নবাগতদের স্বাগত সম্ভাষণ জানানোর আসর ; চেষ্টা করছি যাতে গতানুগতিকতার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে অনুষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে করা যায়।

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ :

আমাদের কার্যকালীন ভূজ্ঞান বিভাগ থেকে একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিভ্রমণ সংঘটিত হয়েছে। ডেহ্‌রী অন্‌ শোন, বাঙ্গারী, রোটাস, রাজগীর, গয়া, নালন্দা, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণটি পরিচালিত হয়। ডক্টর নিশীথরঞ্জন করের নেতৃত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

চব্বিশে জানুয়ারী পরিষদের সকল ছাত্রছাত্রী মোটর-বাসযোগে কল্যাণী, কাঁচড়াপাড়া, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে যান। পরিচালনা করেন অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন কর।

ফেব্রুয়ারীর দশ তারিখে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যাপক সত্যকাম সেন ও অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তারকেশ্বর, ধনিয়াখালি, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হরিপাল, সিংগুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন।

এ ছাড়াও, প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা আলিপুর আবহ অফিস ও দমদম বিমান-বন্দরে আবহসংক্রান্ত তথ্য, 'রেডার' ব্যবহার-প্রণালী জ্ঞাতার্থ গমন করেন। অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন করের ব্যবস্থাপনায় পরিভ্রমণ দুটি বিভিন্ন দিনে পরিচালিত হয়।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও প্রাচীর-পত্রিকা :

ভূ-জ্ঞান পরিষদ থেকে দুটি প্রাচীর-পত্রিকা 'পরিক্রমা', ও 'Traverse' বার করা হয় এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হ'য়ে থাকে। স্থানাভাব ও পর্যাপ্ত উৎসাহের অভাবে এ-দুটি বিভাগ আশানুরূপ উন্নতি করতে পারছে না, তবে, এই বিভাগের সম্পাদক ও সম্পাদিকাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কারণে যে, গত বৎসরের তুলনায় তাঁরা এই বিভাগটির অন্তত কিছু উন্নাত করতে সমর্থ হয়েছেন।

পাঠাগার :

পরিষদীয় পাঠাগারটি আমাদের একটি গবের বস্তু। পুস্তকসংখ্যা পনেরো শোর ওপর এবং ক্রমশই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বর্তমানে পাঠাগারটি খুব সমৃদ্ধই বলা চলে। পাঠাগারটির ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির জন্য ও সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেশ চক্রবর্তীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শোকসংবাদ :

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সুযোগ্যা ছাত্রী শ্রীমতী গৌরী ঘোষের আকস্মিক মৃত্যু আমাদের সকলকে শোকাতুর ও হতবাক করেছে। তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি আর তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানাই সমবেদনা।

পরিষদের সম্পাদক হিসেবে কখনও কোনো অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের এবং বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হই নি। তাই শুধু অনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইতি টানছি।

চন্দ্রাবলী রায়, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
যুগ্ম-সম্পাদক

PRESIDENCY COLLEGE DEBATING SOCIETY

ON THE OCCASION OF WINNING THE 'ASUTOSH MEMORIAL SHIELD (INTER-VERSITY, 1963) ; THE 'PRASUN MEMORIAL CUP' (1963) AND THE 'JUNIOR CHAMBER OF COMMERCE CUP' (1963)

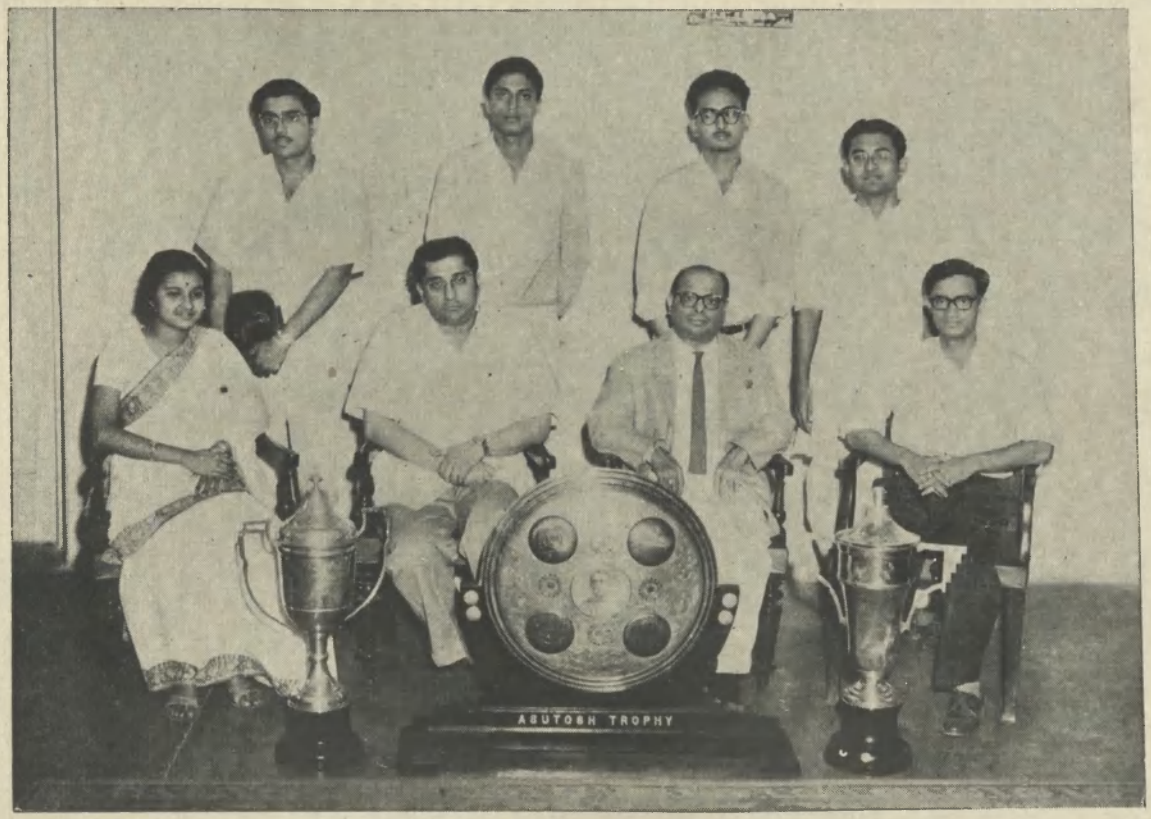

Sitting from left to right : Miss R. Guha ; Dr. S. Mukerjee. *Chairman, Debating Society* ; Dr. S. K. Basu, *Principal* ; P. Majumdar, *General Secretary* ;

Standing from left to right : K. Chakravorty ; V. Lal ; J. Bhattacharya ; P. Guptabhaya. *Debate Secretary.*

বিতর্ক পরিষদ (১৯৬২-৬৩)

দেশের আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থার কথা স্মরণ রেখে ছাত্র ইউনিয়নের অন্যান্য বিভাগের মতো এ-বছরের বিতর্ক পরিষদকে অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়েছে। অর্থের অপ্রাচুর্যের জন্য বিতর্কের আয়োজনকে করতে হয়েছে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

এ-বছর জরুরি অবস্থার জন্য প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছিল, তাই প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের বিতর্ক দিয়ে বছরের কাজ শুরু হয় নি। ২৯শে জানুয়ারী বছরের প্রথম বিতর্কে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ পরস্পরের সম্মুখীন হন। সভায় প্রতিপাদ্য ছিল 'ভারতের আধ্যাত্মিকতার নব মূল্যায়নের উপরই তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতি নির্ভরশীল।' প্রস্তাবের সমর্থনে ছাত্রদের পক্ষ থেকে বলেন শ্রীমতী রানু গুহ, শ্রীজয়ব্রত ভট্টাচার্য ও শ্রীদীপাঞ্জন রায়চৌধুরী। অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনন্দলাল ঘোষ, শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশীনরঞ্জন দাশগুপ্ত।

৫ই মার্চ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এর পরবর্তী একটি বিতর্কে মিলিত হন। বিতর্কের বিষয় ছিল 'রোম্যান্টিকতার যুগ বিগত হয়েছে।' অংশ নেন শ্রীঅভিজয় কার্লেকার, শ্রীদেবব্রত কর, শ্রীপ্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, শ্রীকান্তক দাশগুপ্ত, শ্রীবিজয় লাল, শ্রীঅনুরঞ্জন সিং, শ্রীঅদিতিনাথ সরকার ও শ্রীমতী সুনন্দা চট্টোপাধ্যায়।

আফ্রিকান ছাত্র-পরিষদের প্রতিনিধিরা এর পরবর্তী এক প্রদর্শনী বিতর্কে কলেজের দলের সঙ্গে মিলিত হন ৩০শে মার্চ। শ্রীডগলাস কাডেনহে-র নেতৃত্বে আফ্রিকান দলের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীকুরী, শ্রীমোয়ানদানজী ও শ্রী এইচ্ এইচ ভিলা। প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে শ্রীমতী রানু গুহের নেতৃত্বে বলেন শ্রীঅভিজয় কার্লেকার, শ্রীদেবব্রত কর ও শ্রীঅদিতিনাথ সরকার। সভার বিতর্কের বিষয় ছিল, 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিই শান্তির একমাত্র পথ'।

গ্রীষ্মাবকাশের পর ১৪ই অগস্ট প্রাক্তন বনাম বর্তমান ছাত্রদের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান ছাত্রদলের (শ্রীবিজয় লাল, শ্রীদেবব্রত কর, শ্রীঅভিজয় কার্লেকার, শ্রীঅদিতিনাথ সরকার) প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, 'বই কখনও শ্লীল অথবা অশ্লীল হ'তে পারে না। হয় তা সুলিখিত অথবা কুলিখিত হবে'। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন প্রাক্তনদের মধ্যে শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃতানন্দ দাশ, শ্রীঅনুপম বসু ও শ্রীহিরণ্ময় কার্লেকার।

২৪শে অগস্ট ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর একটি প্রতিনিধিদল (শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত, শ্রীশ্যামল ঘোষ, শ্রীমতী ঈপ্সিতা চক্রবর্তী, শ্রীমতী প্রণিতি ঘটক) বিতর্ক করতে আসেন। বিতর্কের বিষয় ছিল 'ইতিহাস যেমন হওয়া উচিত ছিল, বাস্তবে তা ঠিক সে-রকম নয়'। শ্রীজয়ব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কলেজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীদেবব্রত কর, শ্রীসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅদিতিনাথ সরকার।

সেপ্টেম্বরে নবাগত ছাত্রছাত্রীরা একটি বিতর্কে অংশ নেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি আমাদের একটি 'মক-পার্লামেন্ট' করার পরিকল্পনা আছে। এই লেখা দেবার সময় পর্যন্ত এ-ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় নি।

ব্যক্তিগত কৃতিত্বের তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলে শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীজয়ব্রত ভট্টাচার্যের স্থান লাভ, শ্রীবিজয় লাল ও শ্রীঅনুরঞ্জন সিংহের আশুতোষ শীল্ড লাভ এবং শ্রীজয়ব্রত ভট্টাচার্যের হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মৃতি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিশেষ পদক লাভ। এ-ছাড়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীরানু গুহ, শ্রীদেবব্রত কর, শ্রীদীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, শ্রীসুজিতশংকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমনোমোহনলাল আগরওয়াল, শ্রীউদয়ন দাশগুপ্ত, শ্রীরঞ্জন রায় প্রমুখেরা।

ধন্যবাদ জ্ঞাপনের তালিকায় প্রথমেই নাম করতে হয় ১৯৬০-৬১ সালের বিতর্ক সম্পাদক শ্রীতীর্থংকর চট্টোপাধ্যায়ের। এ-ছাড়া যাদের নাম এখন বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীব্রজেশ ভট্টাচার্য, শ্রীউদয়ন দাশগুপ্ত, শ্রীঅভিজৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুষশংকর রায়, শ্রীদীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, শ্রীশ্যামলেন্দু পাল, শ্রীসুমিত মিত্র। আফ্রিকান ছাত্রপরিষদের সঙ্গে বিতর্কটির জন্য শ্রী এইচ্. এইচ্. ভিলার কাছেও আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান শ্রীরাজেন সেনগুপ্ত প্রতিটি অনুষ্ঠান ফিজিক্স লেকচার থিয়েটার-এ করবার অনুমতি দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ডঃ সমরেন্দ্রনাথ ঘোষালের সহানুভূতিও ভুলবার নয়। একটি অনুষ্ঠানে শেষ মুহূর্তে তিনি সভাপাত হ'তে সম্মতি দিয়ে আমাদের প্রথম অনুষ্ঠানকে ৩রাডুবি থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

অধ্যক্ষ শ্রীসনৎকুমার বসু ও পরিষদ-সভাপতি শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ অনুষ্ঠানগুলির সাফল্যের মূলে আছে। তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানো বাতুলতা।

পিনাকী গুপ্তভায়া
সম্পাদক

সাধকপীঠ প্রেসিডেন্সি কলেজ : ১৯৬৩

বাংলা দেশের তো বটেই, সারা ভারতের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের আত্মিক যোগের কথা অস্বীকার করবার নয়। ডানিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যারা জন্মগ্রহণ করেন, সেইসব দেশবরেণ্য ভাব-সাধকদের অনেকেই এই মহাবিদ্যালয়ে হয় শিক্ষক হিসেবে, নয় ছাত্র হিসেবে,— অনেক ক্ষেত্রে আবার ছাত্র হ'য়ে প্রবেশ ক'রে শিক্ষক হ'য়ে জীবনের ব্রত উদযাপন ক'রে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ), জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি স্বগতদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সম্পাকত লোকান্তরিত সাধকদের মধ্যে এবার স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম যুক্ত হ'ল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং ইডেন হিন্দু হোস্টেলের আবাসিক ছিলেন ১৯০২ থেকে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিক্ষেত্রে যারা পুরোগামী, উনিশ শতকের শেষার্ধের সেইসব জাতকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩], ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ [১৮৬৩-১৯১৩] এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী [১৮৬৩-১৯১৫]— এই তিন জনের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ-বছর এঁদের কথা আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি।

দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে ১৮৮৪-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই রসায়ন বিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

উপেন্দ্রকিশোর প্রবেশিকার পরে কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন, তবে ১৮৮৪-তে মেট্রপলিটান কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

নরেন্দ্রনাথেরও জন্মশতবার্ষিকীর বছর এই ১৯৬৩। ১৮৭৯-তে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি ১৮৮০-তে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তাঁর সে-কালের দিনগুলি সম্বন্ধে এই খবর জানা যায় যে, তিনি কলেজে আসতেন কালো আলপাকার চাপকান আর ট্রাউজার্স প'রে, কব্জিতে রিস্টওয়াচ পরতেন। তিনি যখন কলেজের দ্বিতীয় বছরের ছাত্র, সেই সময়ে তাঁর ম্যালেরিয়া হয়। পার্সেন্টেজ কম ছিল ব'লে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় তাঁকে বসতে দিতে বাধা ওঠে। তখন তিনি জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউশানে চ'লে যান।

১৯৬৪-তে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর [১৮৬৪-১৯১৯] জন্মশতবর্ষপূর্তি। ১৮৮১-তে তিনি প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ইংরেজি সাহিত্য আর ইতিহাসের বই-ই বেশি পড়তেন, যদিও তাঁর প্রধান বিষয় ছিল রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা। ১৮৮৮-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

রবীন্দ্র-পরিষদের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ-শতবর্ষপূর্তি উৎসব এ-বছর আমরা উদযাপন করেছি। বাংলা সেমিনারের উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলাল-উপেন্দ্রকিশোর-স্মরণ-সভাও হ'য়ে গেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের স্মরণ-সভার আয়োজনও চলছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ অ্যালাম্নি-অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগেও পৃথকভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ও কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মরণোৎসব উদযাপিত হয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দর-জন্মশতবার্ষিকী আগামী পাঠবর্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র

PRESIDENCY COLLEGE
LIBRARY, CALCUTTA.

লে খ ক - প রি চি তি

শ্রীতীর্থংকর চট্টোপাধ্যায় ॥ ষষ্ঠ বর্ষ ইংরেজী। অধুনালুপ্ত 'বক্তব্য' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সম্পাদক, বিতর্ক পরিষদ, (১৯৬০-৬১)।

শ্রীঅমিয় বসু ॥ ষষ্ঠ বর্ষ ইংরেজী। সংগীত ও পিয়ানো-য় পারদর্শিতা আছে।

শ্রীজিষ্ণু দে ॥ ১৯৬৩-তে কলেজ থেকে স্নাতক হয়েছেন। পদার্থবিদ্যার ছাত্র। 'পরিচয়', 'সাহিত্য পত্র' ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় সংগীত, সিনেমা ও সাহিত্যের সমালোচনা লিখে থাকেন।

শ্রীপিনাকী গুপ্তভায়া ॥ তৃতীয় বর্ষ, রসায়ন। গীটার বাজান। 'স্পার্ক' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত। সম্পাদক, বিতর্ক-পরিষদ (১৯৬২-১৯৬৩)।

আতোয়ান দ্য সাঁতেকজ্‌পেরি ॥ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত না হ'লে আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম কর্ণধার হতেন। তাঁর স্বল্প প্রকাশনের মধ্যে 'Flight to Arras' এবং 'The Little Prince' বিখ্যাত।

শ্রীবাদল মুখোপাধ্যায় ॥ ষষ্ঠ বর্ষ, অর্থনীতি।

শ্রীমতী চন্দ্রাবলী নাগ ॥ তৃতীয় বর্ষ, সাহিত্য।

গুন্‌টাব আইষ ॥ জন্ম ১৯০৫। পশ্চিম জার্মানীতে বাস করেন। বিশিষ্ট কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ্ (চীনা ভাষায় সুপণ্ডিত)। ১৯৬২ সালে ভারত-ভ্রমণকালে কলকাতায় এসেছিলেন।

হাইনরিষ হাইনে ॥ অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত জার্মান কবি। বাংলা দেশে তাঁর জনপ্রিয়তার নিদর্শন হিসেবে তাঁর পাঁচজন অনুবাদকের নাম করা যায়ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও সৈয়দ মজতবা আলী।

শ্রীসুজিতশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ॥ দ্বিতীয় বর্ষ, অর্থনীতি। তিন বৎসরকাল হ'ল জার্মান ভাষা আয়ত্ত করছেন; কলকাতায় গুনটার আইষের সঙ্গে আলাপ হয়।

শ্রীসুমিত মিত্র ॥ প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে ডাক্তারী পড়েন। গীটার বাজান।

শ্রীঅতীশ দাশগুপ্ত ॥ তৃতীয় বর্ষ ইতিহাস। 'কথা' পত্রিকার সম্পাদক। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে থাকেন। এই সংখ্যায় তাঁর আঁকা একটি স্কেচ প্রকাশিত হ'ল।

শ্রীমতী মালিনী বসু ॥ প্রাক্তন ছাত্রী। বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়েন। 'সন্দেশ' 'পরিচয়' ও 'গল্প-ভারতী' পত্রিকায় কবিতা ও গল্প লিখে থাকেন।

শ্রীদীপংকর দাশগুপ্ত ॥ পঞ্চম বর্ষ, অর্থনীতি। ইংরাজী ও বাংলায় অভিনয় ক'রে কলেজে ও বাইরে খ্যাতি লাভ করেছেন। নৃত্যকলায় উৎসাহী।

অধ্যাপক সুবোধকুমার মজুমদার ॥ ইতিহাসের অধ্যাপক। পত্র-পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক।

শ্রীমতী শিবানী রায়চৌধুরী ॥ ষষ্ঠ বর্ষ, দর্শন। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি ও গল্পের মাধ্যমে তিনি অল্প সময়েই খ্যাতিলাভ করেছেন।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। উল্লেখযোগ্য বই 'রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজ'।

অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র ॥ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। বিখ্যাত কবি ও সমালোচক। কবিতার জন্য 'উপ্পোরথ' পুরস্কার লাভ করেছেন।

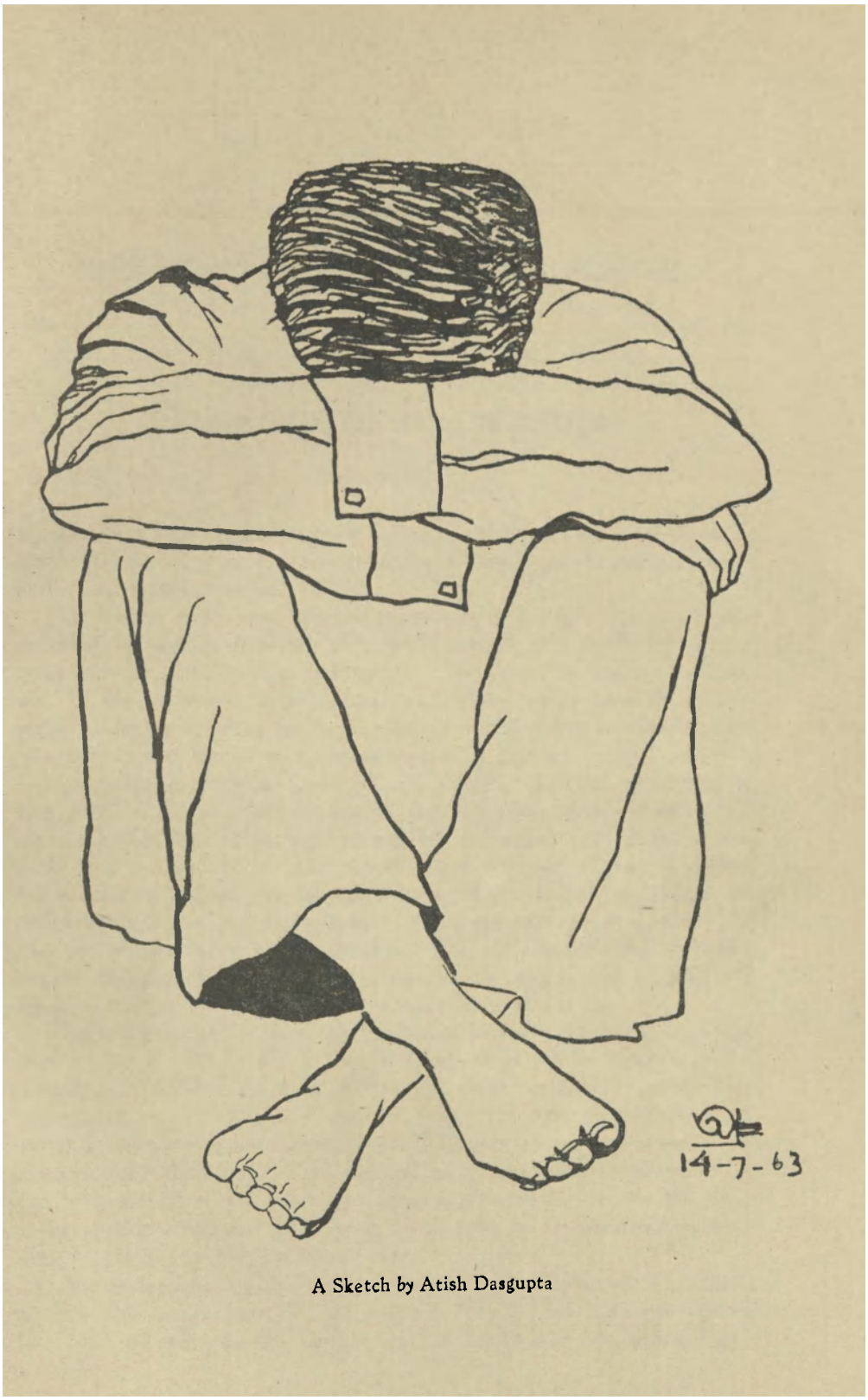

A Sketch by Atish Dasgupta

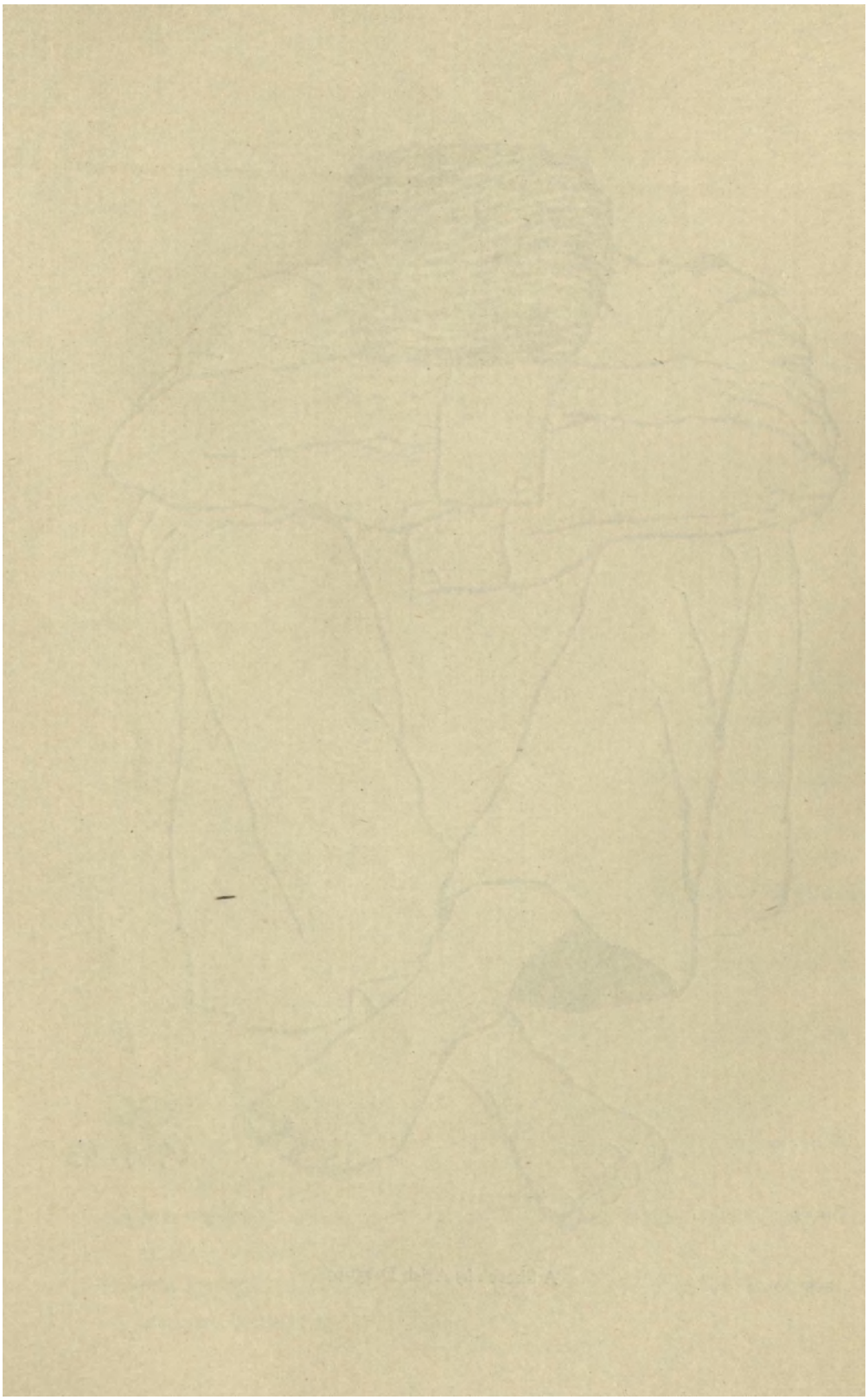

THE
PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

VOL. 45 OCTOBER, 1963

DIAGNOSIS OF DR. BERNIER

SAURIN ROY

FOREIGN travellers in ancient and medieval India have always been a source of knowledge to us. Amongst them, a Frenchman, Francois Bernier, draws our special attention.

Dr. Bernier was a man of great importance of his age. He was highly educated too—had a doctorate from the University of Montpellier—and a great traveller, both in Asia and Europe. Moreover, he was a physician, and we are to bear it in mind that a physician always tries to cure a malady whether it be in his jurisdiction or outside. Let us now analyse what Dr. Bernier has to say before we assess its merits.

Dr. Bernier came to India during the last days of the reign of Emperor Shah Jahan when the terrible fratricidal war among his sons had already broken out. Naturally, Bernier felt interested, and he gives us a fairly long account of the whole affair. More important for us, however, is his letter to Colbert, the famous minister of Louis XIV of France, in which he deals with the topography of Hindustan, its resources, the army and the administration of the Emperor. He also discusses the tendency towards the acquisition of gold and silver in the country and suggests the fundamental cause of the economic stagnation of the country.

According to Dr. Bernier, the absence of private property in land was at the root of all trouble in the Mughal period. The King was the proprietor of more or less every acre of land in the country. This, Bernier pointed out, led to all sorts of complications. The King, as proprietor of the land, made over certain areas called 'Jaigirs' to military men as an equivalent for their pay. Similar grants were also made to governors in lieu of their salaries, while lands not so granted were retained by the King as the peculiar domains of his house; upon these he kept contractors who were bound to pay him an annual rent.

The persons thus put in possession of the land, whether as 'Jaigirdars', governors, or contractors, Bernier pointed out, had an authority almost absolute over the peasants, and nearly as much over the artisans and

merchants of the towns and villages within their district. But they cared little for constructive development of the economy because they held office solely at the King's pleasure and their tenures were ordinarily far too short and always far too uncertain to justify any expenditure of capital or effort on a constructive scheme of planned development. Their usual policy was, therefore, to exact from the peasants the maximum they could be made to pay, and then leave the future to look after itself.

This pressure on the people was intensified all the more by the practice of selling different provincial governments for immense sums in hard cash. Hence it naturally became the principal object of the individual, thus appointed governor, to obtain repayment of the purchase-money which he borrowed at a ruinous rate of interest, and also something extra as his own income.

Thus, the political and social set-up of the country was usually hostile to economic progress. The high pitch of the revenue demand approximating to the full economic rent was a serious damper on agrarian development, and its influence was necessarily increased by other miscellaneous exactions. And there was none before whom the injured peasant could present his case, for the Kajis and other judicial officials were not invested with sufficient power to redress the wrongs of these unhappy people. The net result was that many of the peasants, driven to despair by so execrable a tyranny, fled to some neighbouring state in the hope of finding milder treatment, or joined the army. Thus the normal position, according to Dr. Bernier, was a contest between the administration and the peasant—the former attempting to discover and appropriate what the latter endeavoured to retain—an environment in which agrarian development could hardly be expected to make much headway.

Further, the absence of private property in land, Bernier argued, deprived the people of their chief interest in cultivation. After all, it is the hope of enjoying and retaining the fruits of his industry and transmitting them to his descendants that forms the mainspring of human activities. And as the people had no property rights in land, they had no heart in cultivation. The result was that the soil was seldom tilled otherwise than by compulsion, and a great part of it was rendered unproductive for lack of irrigation.

Besides, the absence of private property in land, Bernier pointed out, led to the development of an interesting economic phenomenon—the tendency towards the absorption of gold and silver in the country. Bernier argued that gold and silver, after circulating in every quarter of the globe including even Armenia, came at length to be swallowed up in Hindustan, for India did not export gold and silver, but made her returns in merchandise.

But though the Mughal empire was such an "abyss for gold and

silver", the precious metals were, according to Bernier, not in greater plenty than elsewhere. The principal cause of this apparent scarcity was, however, the direct effect of the administration of the country. As the policy of the administration was to exact from the people the maximum they could be made to pay, they followed the practice of burying their gold and silver at great depth in the ground in the belief that the money concealed during life would prove beneficial to them after death. This habit of secretly burying precious metals and thus withdrawing them from circulating meant a tremendous wastage of capital which could have been profitably used for productive purposes.

In this way, Bernier argued, state ownership of land was the fundamental cause of economic stagnation of the country and its abolition alone could have restored vigour to the Mughal system. He compared the conditions of India, Persia and Turkey where state ownership of land prevailed with those of the European countries where there was private ownership of land, and concluded that the prosperity of a kingdom depended absolutely upon the recognition of the principle of private ownership of land.

The time has come now when we must part ways with Dr. Bernier. Today it is a bit difficult to accept his diagnosis of the malady which paralysed economic development in India. It is possible that the prevalence of private ownership of land might have facilitated economic development in India. Yet, Bernier's view that state ownership of land was the fundamental cause of economic stagnation of the country and that its abolition alone could have served as a panacea for all evils is open to several objections.

Bernier compared the conditions of India and France. But it is to be noted that in France private ownership of land was an outgrowth of evolution—a historical phenomenon, while in India, if we look back to the pre-Mughal period we find already the tendency of state ownership of land at work. Thus there was a fundamental difference in the institutional set-up of India and France which Bernier unfortunately ignored. Actually speaking, the introduction of private property in land presupposes certain conditions. One is peace and order. But during the later Mughal period if anything was lacking that was peace and order, and in that case, the introduction of private ownership of land could only have aggravated the prevailing anarchy, thereby reducing the chances of economic development to practically nil.

Again, the primary assumption on which Bernier's theory is based, namely that the institution of private property alone could provide the people with the necessary incentive for production, is rather an oversimplification. If state ownership of land necessarily meant economic

stagnation, as Bernier had tried to prove, then how are we to explain the mammoth economic development of the totalitarian countries, specially Soviet Russia, achieved in the briefest possible time? Indeed, there should be no dearth of incentive to people if they are rewarded according to their labour. In a centralised system, achievement in any sphere depends on the plan and its execution. The concerted action—the result of a feeling of unity of interest—is the life blood of success in a centralised enterprise. In India, unfortunately, kings generally treated their subjects with disdain and shifted the whole onus on their shoulders and, consequently, their officials had little to do except exacting the people.

But as far as the high-handedness and tyranny of the Jaigirdars are concerned, it may be argued that Dr. Bernier presented only one side of the shield. The possibility of the Jaigirdars being Shylocks is counterbalanced by the possibility of their being wise and benevolent administrators. In fact in an empire like India it all depended on the personality of the emperor—whether he was masterful and strong-minded enough and really interested in the material and economic well-being of his subjects.

During the reign of Akbar, for example, who evinced a genuine concern for the economic development of the country, people were on the whole contented and there was no peasant uprising or anything of the like on a large scale. It is rather important that when Bernier came to India the mind of Aurangzeb, the then Emperor, was taken up with things other than economic development and, consequently, provincial authorities made no mistake whatever to utilise the situation.

Thus the changeover of situation in the reign of Aurangzeb was not due to the absence of private ownership of land in any way. If the welfare of the people which is consequent upon economic development could be assumed with state ownership of land at the time of Akbar, the same could be done if Aurangzeb did not lack what Akbar possessed. In fact the personal outlook of Aurungzeb was more important a cause than anything else for the economic stagnation of the country in his period.

Moreover, political stability and security, which are the *sine qua non* of economic development, were conspicuous by their absence in Aurangzeb's period and this was a check on possible developments.

In fact, economic stagnation of India in the Mughal period was not due to a single particular factor, much less to the absence of private ownership of land, but it was rather the product of a complete set of forces retarding growth. Political instability, scarcity of capital, absence of a well-developed money market and various openings for the diversion of capital and so on—all these hindered economic development in India and they were totally unrelated to state ownership of land. So far as the scarcity of capital is concerned, it was due as much to the effect of the administration, as Bernier had argued, as to the "shyness of capital", or,

in other words, the inherent unwillingness of the Indian people to invest capital—a psychological rather than a physical phenomenon.

Further, Bernier's contention that India serves as the idyllic burial ground for precious metals from all parts of the world may be doubted. The Inter-Asian trade had already developed by the end of the sixteenth century and reasserted itself in the latter half of the seventeenth century, so that it is really doubtful whether bullion from all parts of the world came to India.

But Dr. Bernier cannot be dismissed without a word of praise. Following Schumpeter, the great economic historian, we can use two foot-scales to measure the greatness of an economic analyst, viz., the analytial set-up of the writer and his contribution to subsequent development.

So far as Bernier is concerned we cannot but admire his argumentative capacity. His logic is forceful, systematic, convincing at first sight and admittedly his observations on actual conditions of the peasantry in Aurangzeb's reign are of great value to us. Thus in so far as his scheme of analysis, its contents and arguments themselves are concerned, they are flawless, so to say. But, unfortunately, things are not what they seem nor do they seem to be what they really are. And on a closer look, it is difficult to accept Bernier's diagnosis of the malady which paralysed economic development in India in the Mughal period.

But, for this, Bernier alone is not to be blamed. The difficulty for him was that he was a Mercantilist and a Frenchman to the core.

Naturally, therefore, his was rather an oversimplified perspective and he tried to view the Indian economic theatre through a French opera-glass; but, unfortunately for him, the Indian characters would not dance to the French tune.

THE NEW "MISTRESS" OF THEORETICAL PHYSICS

KALYAN KUMAR MUKHERJEA

IN explaining natural phenomena, the theoretical physicist always tries to avoid the consideration of entities which are unobservable. The chaos in late-nineteenth century physics was caused by the hypothesis of an all-pervading (and unobservable) "aether" which physicists had introduced in order to explain the propagation of lightwaves across the vacuum of outer space. As soon as an experiment was made to detect motion with respect to the aether—the Michelson-Morley experiment—troubles arose. It ultimately resulted in the appearance of the theory of relativity and the widely known and even more widely misunderstood concept of "space-time." And now it seems that space-time too has had its day and is on the way out!—at least from the domain of microscopic physics.

To give a coherent account of the development of this school of thought which rejects considerations involving space-time from the realm of microscopical (or more precisely elementary-particle) physics, it is necessary to survey briefly the methods of "Classical" modern physics. The paramount effect of the theory of relativity on the methodology of theoretical physics was that it made "field theories" fashionable.[1] A field theory, to elucidate crudely, does not explain phenomena by postulating forces or interactions between objects or entities (like charge, dipole, etc.). It postulates that the state of space is altered by the presence of certain entities giving rise to a "Field." For example, an electric charge gives rise to an electric field; currents give rise to magnetic fields, matter gives rise to the gravitational field. The theory then sets down certain laws obeyed by the field (usually in the form of equations) and these laws afford a complete solution of any relevant physical problem. Maxwell's theory of the electromagnetic field—formulated in pre-relativity days but found satisfactory even afterwards; Einstein's theory of the gravitational field are perhaps the best-known examples of such a system. Now one idea is inherent in a field theory—the idea of *exact location* in space-time.[2] And this is exactly why it is felt by an increasing number of physicists that field theories have no place in microscopical physics.

Quantum mechanical considerations show that an exact position

[1] The choice of the word "fashionable" is not by any chance intended as a slight on the field-theoretic approach.

[2] The very idea of "exact" location is now held in doubt by some physicists —notably Heisenberg—but I am unaware of the existence of any satisfactory field theory which rejects such an idea.

determination is impossible—even in theory. First, the Uncertainty Principle of Heisenberg forbids the simultaneous determination of position and momentum of a particle to be exact. We may try to determine the position only, but even then troubles arise when relativistic considerations are taken into account. A typical experiment for the determination of the position consists of bouncing a photon on the "test-object" and observing the reflected photon. (In fact, the wave-like behaviour of matter permits us to use elementary particles instead of photons.) Now the accuracy of this experiment is limited by the diffraction of the photon—the order of accuracy obtainable being that of the wavelength of the photon or other "probe" particle we use. If we reduce the wavelength of the "probe", its energy increases proportionately and we can go on getting more and more accurate determinations of the location of the object till the energy of the probe equals the relativistic energy-equivalent of the (rest-) mass of the test object. At this stage interaction occurs between the probe and the test object, giving rise to the production of new elementary particles, and the configuration which we were trying to observe is radically altered. Thus there is a definite upper limit to the accuracy with which a position determination (in space-time) can be made in the realm of microscopical physics. This seems to suggest that in such a domain "space-time" is unobservable and in fact a piece of fiction!

These difficulties were realised even in the early days of quantum mechanics but serious doubt on the role of space-time had not been cast because of the initial success of the Quantum Field theory. This theory arose from an effort to adapt[3] Maxwell's electromagnetic theory to microscopic domains, i.e., they arose from an attempt to quantise the equations of the electromagnetic field. The quantising conditions were in the form of power series involving a dimensionless constant, $4\pi e^2/hc$[4] (e=charge of an electron, h=Planck's constant and c=velocity of light in vacuo). This theory has been highly successful in predicting and explaining the behaviour of the so-called "weakly" interacting elementary particles. This initial success still further enhanced the prestige of field theories, so much so that even when it was found that this theory was helpless in explaining the behaviour of the much more general class of "strongly" interacting particles most physicists were loth to discard it. They tried (and are still trying) to modify and correct the field theory. "Before we could reject this faithful mistress (field theory) who had been faithful to us for so long it was

[3] To adapt a macroscopical theory for application in "atomic scale", we have to prescribe certain conditions to be satisfied by dynamical variables. These prescriptions known as "quantising conditions" involve a fundamental constant, h,—Planck's constant.

[4] The value of this constant, 1/137, has caused much speculation and surmise among physicists and philosophers.

absolutely essential to find an attractive replacement!"[5] .."It seems that such a replacement has at last been found the S-Matrix theory. But before we can appreciate the charms of our new "mistress" a digression is necessary.

A physical theory is in essence a set of rules prescribing the dependance of observable physical magnitudes, and this set of rules is capable of explaining and/or predicting the result of objective experiments. The confidence and value of physical theory are directly proportional to the number of results it can predict or explain and inversely proportional to the number of *ad hoc* assumptions it involves. Moreover, a theory which in addition is aesthetically pleasing or beautiful, is naturally more appealing.

The observable in elementary particles physics are restricted in number. They are: momentum[6] and energy. These can be determined up to any desired degree of accuracy. Then again there is only one experiment by means of which we may study the behaviour of elementary particles. This experiment consists of smashing together a number of elementary particles and observing the end product. Now the S-matrix theory uses nothing but these few observable physical magnitudes and phenomena.

The S-Matrix is an infinite, square array of complex numbers, of the general form

Sa, b.....; c, d.....

which obey certain rules.[7] The subscripts a, b..... and c, d..... indicate the initial and end-products of the experiment performed. The only *ad hoc* assumption is the analyticity of these elements, i.e., they admit of power-series expansions in their argument variable. All the other properties (which have been given in footnote 7) are results of deductions—they are *not* assumptions.

Let us now assess the qualities of our new mistress. It has succeeded in explaining results which the older Field theory had tried to resolve but failed; it has only observables[8] involved in its structure and it requires only one *ad hoc* assumption—that of analyticity. Thus our new mistress appears to be a "good" physical theory. But what of beauty? Here our new mistress is uncomparably superior to our previous one—her simplicity (albeit superficial) lends her a charm greater than that of the complicated quantum field theory.

---

[5] Prof. J. Chew: Rouse Ball Lecture, Cambridge, Spring 1963.

[6] It is surprising, but nevertheless true, that though position is indeterminate, momentum or equivalently velocity is a "truly" observable magnitude.

[7] The S-matrix is an infinite, unitary matrix whose elements are Lorentz-invariant, analytic functions of momentum-energy variables possessing only such singularities as are necessary for the S-matrix to be unitary. Lorentz—invariance ensures that it satisfies the theory of relativity.

[8] This point, as will be seen later on, is open to some difficulties and doubts.

Then why hasn't there been a stampede into the extended arms of this new enchantress? The reasons are quite considerable in number.

One: Some physicists are mystified (and hence repelled) by the assumption of analyticity.

Two: Physicists have become used to explaining natural laws by means of equations. But our S-matrix theory does not contain any equations—in fact the entire theory is expressed by the single sentence:

The S-matrix is an infinite unitary matrix whose elements are Lorentz-invariant analytic functions of momentum-energy variables possessing only such singularities as is necessary for the S-matrix to be unitary. *Full stop*! *Nothing else*—the whole crux of the theory is there! Equations are indeed there but hidden away. The condition for analyticity gives us the Cauchy-Riemann equations and the singularties furnish us with a knowledge of the poles and branch-points. But this does not satisfy many physicists—especially the older ones.

Three: Our new mistress, admirable in so many ways, is (as may well be expected) rather difficult to handle. She has so much within her that we do not know what to do with it. The analyticity conditions give us an infinite set of Cauchy equations which should suffice to solve our problems. But how do we handle this infinite set of equations? This difficulty however will soon be got over, one hopes. Intensive research in evolving new techniques are being carried on all over the world. It seems to be only a matter of time for a satisfactory computational technique to evolve.

Four: And this perhaps is the only fundamental objection against the S-matrix theory. Present-day data seem to indicate that an *exact* knowledge of the particular elementary particles which exist in a given configuration is extremely difficult to obtain. And hence the a, b....., c, d..... subscripts of the S-matrix elements are, at best "barely-observables", if not "unobservables".

However there is a lot of ground for optionism in favour of our new nistress. Quantum field theory, it seems, has definitely exhausted its resources, while the S-matrix remains virtually unseathed and unexplored. Its promise is unbounded.

"The twentieth century has already witnessed two great revolutions in physics—the theory of relativity and the quantum theory. It seems that we are standing on the threshold of a third great revolution."

[9] Prof. Chew: Rouse Ball Lectures; Cambridge, Spring 1963.

AND IT GREW WONDROUS COLD

AVIJIT GUPTA

THOUGH at present about ten per cent of the earth's land surface lie under a blanket of ice, according to the scientists, we are now going through a warm period, far warmer than what it was thousands of years ago, when glaciers laid down a thousands-of-feet-thick blanket of ice on a continental scale. Large tracts of North Siberia were under conditions similar to that of the 1963 A.D. Greenland or Antarctica. Ten thousand feet of ice lay on the land, obliterating every trace of moutains and valleys, rocks and soil. What will happen if India gets (although, it seems inprobable) this two miles thick ice cover? Throughout the entire peninsula, the Ganges valley, the Thar Desert and the Indus, there will be nothing but white ice and snow. Further to the north, a mighty mountain chain will come out from beneath the ice cover—it will be a land of black fangs pointing to the sky and huge glaciers coming down over the sub-continent. South of the mountains there will be nothing but a white sheet with an undulating to where wind will whip up huge dunes of ice (like the Antarctic sastrugi) and large crevasses will yawn. On the coast big slabs will calve off from the mainland ice and will go floating into the Bay and the Arabian Sea (always provided that they have not frozen up by this time) as gigantic icebergs.

Such things, though not in India, were seen during the past ice age. The continents developed several centres near the poles where ice started to accumulate. As ice started to pile up, it slid under gravity and flowed out in different directions, mainly southward.

As ice started to come south, it crept over surface that was not modelled by ice but rather by rivers and wind. Naturally there were some valleys, low lands and mountain passes. Naturally again, the south-moving ice used these routes rather than taking a bulldozer attitude and trying to push on a wide front irrespective of obstacles (like mountain spurs) in the path.

As ice moved south in this way, it was found that from a compact icefield far to the north, lobes of ice were running south, utilizing the easier routes, like army columns into a foreign country.

What happens when ice moves over a rock surface? The surface gets scratched, grooved and polished. Huge boulders are detached from the mountain-sides and picked up by the ice which carries them down for miles and dumps them on a low, flat plain where they remain—an erratic sight, a boundler strangely out of place on an alluvial plain, like a sandbag dropped by a lorry on the Grand Trunk Road.

As more and more ice pushes its way through a pre-existing valley, the valley is widened. Every valley that has been invaded by ice bears a peculiar shape—it looks like a huge "U"—with wide flat floor and precipitous sidewalls. Mountain spurs that get in the way are cut out and removed as if someone has used a saw on them and faceted mountain sides rise steeply from the valleys.

Ice invasion creates many other topographical features. We may take the examples of the glacial-formed lakes. Often a tongue of ice gets between the flow of a river and its outlet in a sea or lake, thus damming up the river and holding its water in a large reservoir. The best example comes from the USSR.

As the ice front advanced south there, the climate in front of it obviously turned cooler which led to increased precipitation and decreased evaporation. As a result the Caspian and Aral Seas grew much larger in size so that they overflowed westward and into the Black Sea. Ice blocked the mouth of the north-flowing rivers, the Ob and Yenisei. Naturally a vast lake developed in southwestern Siberia, which in turn found its outlet south to the enlarged Caspian. This proglacial lake was evidently the largest known freshwater one. The amazing flatness of Western Siberia is partly due to the silt deposited by this lake.

As stated earlier this advance of ice was due to the change to a cold period from a warm one. After some time the normal warm climate of the earth was restored. Obviously the ice started to melt and retreat. As it went back, it exposed from beneath its cover the change brought by it on the earth's surface—deposits of boulders and sand lay about giving the land a particular glacier-influenced look. Former drainage systems were disrupted, water of a stream was diverted into another, lakes and swamps were created. All these are the marks left by glaciers exhibiting the extent and intensity of their advance.

Glacier ice is actually ocean water frozen and now held up on the land. It actually means a withdrawal of water from the seas. Now what happened when in the past ice age huge glaciers came into being? They stored up so much water that the level of the ocean fell between 300 and 400 feet exposing vast tracts of the sea floor. When with the return of the warm period the icesheets retreated and melted, all these exposed tracts got drowned.

What will happen if the sea-level is lowered 300 feet from its present position? Norway and Greenland will be almost joined together with a sill of land which now lies barely 300 feet below sea-level; North America will be joined with Siberia by a stretch of land at the place of the present-day Bering Strait. Actually it happened a long time ago and prehistoric man moved with many types of animals from Asia to North America during the last advance of the ice and pushed down the new continent at fervent

haste till he reached the tip of South America. Again, many of the coastal islands became a part of the mainland during the ice age, as, for example, Ceylon found herself joined with the Indian Peninsula. All these attaching links were drowned in the great return of water with the retreat of ice, 11,000 years ago.

What brings about an ice age? During the last million years there have been four advances of ice and three warm periods not counting the present warm one. Obviously there is a cycle somewhere. What makes it go round? In the mid-fifties two men, Geophysicist Maurice Ewing and Geologist William Donn solved the problem with an explanation that reads like a tale out of the 'SF stories of the year'.

From the south oceanic currents drift warm water towards the north, over the Norway-Greenland sill and the Bering one, into the frozen, almost land-locked, Arctic. The Arctic is a frozen ocean but as drift after drift of warm water enters it, it starts to melt, till after a suitable interval of time it melts completely and turns into an open ocean—an open staretch of water right over the North Pole.

An open stretch of water naturally leads to evaporation. Water vapourises into the air, condenses, moves over the surrounding high-latitude landmasses and pricipitates in the form of snow. As more and more snow accumulate, glaciers start, and start to move south ushering into the world another ice age. But these glaciers really are made of water arrested in their return journey to the seas. So what happens? The sea level falls. As glaciers grow, the sea level drops till the Norway-Greenland sill rises above the ocean and cuts off the Arctic from all other oceanic bodies.

The Arctic is deprived of her supply of warm water. It starts to freeze over again, and with time there is a land-locked frozen Arctic Oceam. Naturally the evaporation comes to a halt and with it the supply of snow to the glaciers. Deprived of their fresh supply, the glaciers start to melt, to shrink, to go back, giving way to another warm period. And as they go back, the melt water released by the glaciers flows into the seas and starts to raise the level. As it goes on, a time comes when the level rises above the still-barrier separating the frozen Arctic and warm currents again start flowing into it. The cycle is complete.

Fantastic? Yes, certainly. Impossible? Well, no; there has been so far no definite evidence against it and, you know, anthropologists have found out that prehistoric men lived on the shores of the Arctic. What would men do on the shore of a frozen sea? Obviously, they settled there, because they could live there. The Arctic was definitely open and they could gather food.

Well, if the theory holds good then we are clearly heading for another ice age. More and more water is flowing into the Arctic over the Norway-Greenland sill. In about a thousand years there may be a glaciation

coming. But before that there will be more and more shrinkage of the present-day glaciers and as a result the sea level will continue to rise. If the sea level rises, coastal engineers all over the world will be confronted with the problem of saving the coastal ports and cities from the invasion of the sea. Then as the new glaciation starts the sea level will fall, relieving the coastal engineers, but due to the southward advance of ice there will obviously be a lot of changes in the earth's present climatic arrangements. There may be more rainfall in the deserts and in fact it has been calculated that the Sahara will turn into a fertile green tract, one of the best agricultural lands in the world. What should be our policy—to leave the coastal areas and buy land in the deserts? Think it over.

CRUCIFIXION

DIPANJAN ROYCHOWDHURY

IT WAS sultry. The rain might come down any moment and so the man clad in black hastened his pace. There were many like him in that busy quarter of the city—all clad in black-returning from the nearby office-rooms where they kept accounts and made totals of sums of money too large to be tangible and all, of course, belonging to other people. Perhaps they were all as lonley as this man and perhaps they all felt the sultriness as much as he did and had a lurking welcome in some corner of their minds for the rain that was soon to drench them, though they all walked fast ostensibly to avoid it.

These pavement was dry and full of dust which was slate-grey and quite hid the lustre of the man's newly polished boots. The man was walking on, glancing from time to time at the opening in the sky between two banks of cloud. It was not exactly blue or white or any other colour you would expect. There was a lurid glow in the opening and it was like life, he thought, poised so precariously between two darknesses. The evening was peculiarly suited to bring out all the philosophy that was latent in the man clad in black.

Perhaps he saw the beggar or perhaps he just heard the plaintive low moan. But however it was he stopped dead in his tracks and looked at the figure. It was crouching on the pavement in the usual rags and round its forehead was a dirty bandage which perhaps was once upon a time

really white. The beggar looked up with bloodshot eyes and it was discancerting to the man in black to see quite evidently the misery in them, the blood, he thought, the blood. An emaciated hand was stretched out and a cracked voice mumbled the usual round of blessings and entreaties. Life was really hard, thought the man, no longer a lurid glow to be studied in aesthetic detachment, but a living lurid fact that could not be bypassed. He took out his purse, and then he stopped.

This was the twentieth century and life was really very hard, for we had to reason out things and we could not forget that it was reason which makes us what we are and not animals. Why 'not animals'? I once had a dog ... the man was thinking and he stopped again and put his purse back. There were the years of reasoning and the principles they had produced and perhaps it was well that they were against giving alms—there was the degradation you know, both as regards he who gives and he who receives—and perhaps it was not. But this was not the significant fact. The man stood at the edge of the pavement against the high wall of some massive building and he was thinking, thinking deeply, desperately trying to find some reason, some satisfying answer as to why he should give the money he wanted to give to the beggar.

The street lamp threw a shimmering shadow at his feet for the clouds had closed ranks, a wind had risen, and the hood of the lamp was tossing to and fro. The shadows were trembling all around and the dust was rising in slow whirls. One or two dried fallen leaves were carried away brusquely from their places of repose. The men in black were hurrying away everywhere in spite of their desire for a good drenching, for they feared the aftermath.

The man was still waiting and still turning things over in his mind and perhaps he was expecting the rain although he did not know it, for when it came he was not surprised. He moved slightly away under the shelter of a doorway. But the wind was now quite strong and fitful in its direction so that the light rain was often driven into his face bespattering his spectacles with tiny drops which created wondrous patterns out of the neon signs all around.

He noticed that the beggar was getting drenched too. But perhaps this was an everyday occurrence, for the crouching figure made no movement that could mean alarm or anxiety or even discomfort. And the man was thinking, turning over reasons in his mind and rejecting them and the rain did not stop, so that he had an excuse for not returning home in time.

Quite suddenly he saw the woman. She was a short woman hurrying home probably and she did not seem to mind the rain, though he could see that she was absolutely drenched. While a part of his mind carried on the old train of reasoning, another part speculated idly as to what caused her to hurry on in this way in the rain.

The woman had passed the beggar and because it was raining and she was hurrying away or perhaps simply because he had not seen her the beggar did not ask her for alms. Suddenly, the woman stopped and returned. She had her purse in her hand and then fumbled for a minute, for it was raining and quite dark, and she took out a coin and tossed it into the beggar's bowl. It fell on the tattered mat and the beggar was groping for it and she pointed out the piece which was shining on the mat and walked away hurriedly into the distance. The rain stopped and men began crossing and re-crossing the street which was glistening and making efforts at reflecting the multi-coloured lights, the traffic, and the street lamps. The man in black was still standing at the doorstep and the slab above was a shelter and perhaps now a prison. It was the twentieth century and the man in black wept silently.

SYMPOSIUM : *The Two Cultures and I*

[Sir Charles P. Snow thought that the advanced capitalist society is being increasingly split up into two almost exclusive and to some extent hostile cultural 'blocs', viz., those pursuing some science, especially the engineers and technicians, and those studying the so-called humanities. Communication between the two groups is as sparse as their understanding of one another. Even in an age of specialisation, he finds the situation quite alarming.

We have confronted this problem of the "two cultures" to some of our friends and hope that their differences as persons will contribute to the variety of the opinions presented below.]

One : Amitava Bagchi

We have long been warned that the scientists and the artists are moving away from each other. The separation has been most noticeable in this century; the increasing complexity of the modern sciences has caused them to become more and more strange and unfamiliar to the uninitiate; the practice of the creative arts has tended to become more than ever esoteric and alien. The warning is writ large on the horizon—the day may soon dawn when the scientist and the artist will be unable to converse with each other, there being no basic experience common to both.

Though not failing to appreciate the serious effect that yet greater specialisation may have on the relations between the scientists and the artists, I do think the above picture somewhat overdone. I must confess that my night's sleep is not haunted by the spectre of a world in which small groups of specialists inhabit pockets fenced off from others by self-erected barriers of silence; neither do I as a specialist-to-be feel the necessity of extraordinary effort when circumstances prompt me to attempt to bridge that supposedly infathomable abyss separating me from friends whose pursue in life is different from mine. There is no reason why intellectual conversation should be impossible between persons of diverse calling if each cares to interest himself in the other's field.

When I was in school, and that was a mere three years back, I had striven, unbidden and with some success, to divide my time equally between the sciences and the arts. I only became aware of the existence of the two cultures as a problem when passage out of school put an end to the procrastination in the matter of choosing a career. But a choice has not meant wavering from my initial resolution to keep up my familiarity with both cultures. That is possibly why I cannot help feeling that the 'two cultures' loom large as a problem only to those who have shrid away from one or the other (culture).

A faulty educational system coupled with the rigours of a university course do not permit of as much catholicity in one's reading tastes as one would like to profit by. But at those times when examinations and such other preoccupations are distant, it has been my endeavour to utilise my time in such a manner that the future does not find me wanting in the appreciation of the intellectual beauties of fields not my own. It is only thus that I can contribute towards the lessening of misunderstanding and tension the magnitude of which has troubled many minds.

Two : Ranu Guha

It is my sincere belief that spirit and nature are not two separate entities; that intuition and reason must regain their importance as the means of realizing and fusing the inner being with outer reality. The philosophy of life consists in the search for those essentials which link spirit with the realm of matter. The laws of life have their origin deep under the surface of their mere physical manifestations. I do not believe in an inherent clash between the two cultures—one representing the rigorous scientific and technical progress which has released the imitative and creative capacities of man, and the other standing for mankind's eternal quest for the beauties and philosophies of life. Time has come to evaluate the inter-relation of scientific and artistic influences upon man's total experience and advancement. A fresh concept emerges of man thriving in a universe glimpsed through a new vision of reality and imagination.

The science of the nineteenth century offered mankind strictly materialistic concepts. To the Psalmist question, "what is man that thou art mindful of him", science answered, stifling the inner voice, that man was an animated machine or at best a mechanical animal. The philosopher retaliated by denying the outer realities and calling them illusory. The science of the twentieth century however has established new concepts and criteria of reality. It does not merely ask "how" but also enquires "why". Present-day scientific thought gather its materials from philosophies, similarly philosophy also uses scientific methods of reasoning—science and philosophy are supplementary today. Still, the superficial technician tries to enhance the perstige of his creed by decrying the philosophies and the false philosopher on his part shrinks back from the sciences with a supreme attempt at unconcern and disdain. But this strife between man and man, and often between different selves of the same man should not arise. The man of science can never be far away from the man of arts. Within the man himself there is an essential unity. This apparent disparity and plurality of cultures demands a cherishing of the wholeness and human personality and constitutes a striking challenge to man, emerging from the

abyss of meaningless divergences, to be renewed, replenished and rehabilitated in the totality of his experience.

In the quest of the mysteries of universe and human mind, a new and enlarged meaning of man and of nature is taking shape—beyond the scope of mere mathematical and scientific analysis or philosophical and artistic speculations. We are compelled to ponder over and discover a new principle of differentiation and relationship between scientific and philosophical knowledge. A new concept has arisen of their mutual interdependence and basic cohesion. Man's search today is no larger for science or philosophy—it is for knowledge, the ultimate truth.

Three : SURJA SANKAR ROY

THE only times I even regret being sober are on these occasions when I am asked to write or speak on wunky subjects. For example, my ideas about the difference between the two cultures are rather misty. I don't know whether literature includes the whole of life, but I firmly believe if possibly can, that's if it wants to, with certain modifications of course. But one fears that as soon as it starts portraying life in its entirety, that is without weeding out the thorns from the rose-bush, it may cease to be literature. For literature, one must remember, implies a careful selection of details on the part of the author. It is subjective, hence illusory. It aims at a synthesis while science its brother has more of the objective element in it, its shibboleth being observation and analysis. But the object of their quest, —a search for truth and reality is the same, though the paths trodden are somewhat different. While the former expresses truth in terms of the individual's mind which acts like a filter, the latter expresses the same in photographic equations—formulæ, charts, diagrams etc. To me it seems that Truth, like the Greek God Janus, is double-faced and our ideas of the ultimate are disastrously made narrower if we persist in denying the contributions of either of the two methods in its pursuit to fathom the real nature of things. Because the artist and the scientist are one so far as their objective is concerned, I for one felt the need of glancing through Fausman's book on geo-chemistry while reading "romantic" nature poetry. Incidentally, a complete understanding and appreciation of modern sculptures, especially those of Barbara Hepworth implies a thorough knowledge of geometry and it is my belief that students of literature in the near future will consult Uspensky's book on "Probability" before discussing the plot construction of a novel! The concepts of space and time are not only fundamental to physics, they form an intrinsic part of literature as well and so to visualize fully the truth in Shakespeare's sonnets one should look up Einstein's "Special theory of Relativity." The books of

Henry James or James Joyce will leave you half-satisfied if you have no idea about modern psychology which at times is nothing short of unadulterated chemistry. Similarly the other sciences like anthropology and natural history are vital for a more complete understanding and appreciation of literature, and so it's no use reading about the Hiroshima horror when you have no idea regarding the power of an atom!

I hope my readers won't misunderstand me by thinking that I am trying to preach dilettantism like my predecessor Jack (of all trades); I have no such views in my mind. Specialization in one of the two cultures is essential for human life, not to speak of human ability which has many limitations. What I have been trying to suggest is merely this that if you show indifference to the contributions of the other culture you remain as much removed from the truth as the man in the moon is from the earth!

Specialization is vital or else you join that unfortunate brood of average technicians and engineers who belong to neither of the two cultures. They are a disgustingly vulgar set of people feeding on half-baked sciences and ill-cooked arts. Their interest in life ranges somewhere between the two extremities, line advance and Perry Mason! They know something about everything and so don't be surprised if they tell with smile on their lips, "We like Maugham, he's so nice." They can give you an account of Albino tigers without reading a single book on natural history. They even know a word or two about physics for I am told they have to read Sir James Jeans' works and while talking about organic chemistry they'll invariably refer to the seventh chapter of Kamp's book. Statistics too hasn't escaped their notice and if you try to gauge the depth of their knowledge they will keep on saying with an air of finality that Feller's book is a masterpiece. So if you earnestly want to enjoy your evenings, don't invite them to your houses. They won't compliment you on your choice of books or the design of your book cases or your collection of orchids; instead they'll keep on rattling about vector analysis in space and topology, punctuating their conversation by poking with pointed shoes. Eventually they'll round up their boring conversation by equating Sal Ghosal with Chubby Chekker! In ending, however, I must give my impression about the specialists or else my opinions may seem slanted.

When I first entered the Physics Laboratory I felt like stepping into a factory of malevolent miseries. But I had to enter that infernal extension of Hell itself on account of some serious business I had with my friend D—, who happens to be a physicist. He is not a dislikable chap but I generally avoid his company because of the legal inflexibility of his opinions on every subject under the sun. This habit of working by laws and theories (as is done in physics) is not only tiring at times but also a trifle degrading. D—, you must remember, is a reformer in his own little way, he has certain "set cures" for certain "set diseases." For example, he

believes strongly in simple living—that is, wearing special clothes, sleeping in a special kind of room, eating a special kind of sun-cooked food in a special way. He knows for certain that tobacco is bad for its smoke hides the gates of Paradise. But to dismiss him as a moral crank would be doing injustice to him. Like the different experiments in physics, his life has a set pattern—carefully arrived at after years of research and observation. "If you want to know your position in context to your true destiny," he told me once, "you must sip unlimited quantities of lime-juice and hot water, wear porous under-clothings on all occasions, breathe rhythmically and take Eau-de-Cologne vapour baths whenever possible." Unfortunately he hardly knows that the range of life is wider than the subject he is specializing in. No wonder, in spite of his acute intelligence he sometimes mistakes the firefly for the rising sun.

Four : MUKUL KUMAR MAJUMDAR

THE magnitude of divergence between the two cultures has already grown to alarming proportions. Inspired with the fervour for rigour and precision, the science students look, with compassion and contempt, upon the literary creations as ravings of men of an essentially lower calibre. The position of a student of the opposite stream is much more pathetic. Unable either to accept what he gets in the "popular editions" or to explore what he wants to know—for he is mortally afraid of symbols—he allows himself to be overcome by a peculiar cynicism.

The continuance of such a trend is sure to pose a closely related but much more ominous problem. To take what is for me a familiar example, laments were heard in the late thirties about the growing obscurity in the language of economics. By the fifties one could find only the relics of the so-called "diplomatic style of discourse"—characteristic of classical literature; a style which demanded from the students genuine intellectual efforts, but not at all a high degree of technical training.

The stage has now been reached in many a sphere where one cannot find a Jovian figure acclaimed as the master of a subject. The techniques have become so varied and difficult that the lack of communication between the two branches of the same discipline—say, between "mathematical" and "literary" economics—is not less bewildering than that between the two cultures themselves.

To some extent, this is an inevitability. Yet one can hardly conceive of a less unfortunate outcome. Excessive specialization, at least in the intellectual world, is likely to be self-defeating in its purpose. After all, both the cultures have one essential thing in common—they are unearthing the mysteries of Man and Nature. One cannot be separated from the

other. Man is a living soul. The perpetual interaction between his ideas and his environment is the mainspring of all knowledge. There is, therefore, the riddle that there exist analogies between the central features of the various theories implying "the existence of a general theory which underlies the particular theories and unifies them with respect to these central features."

Unless there is a broader perspective, or the consciousness of the existence of that general theory, progress in any particular discipline is likely to be futile—and even dangerous. The progress of science divorced from humanism is the great illusion that has been shattered again and again. What is urgently needed is some sort of ideological synthesis between the two.

How this can be effected is more than what I can say. I fear that in the foreseeable future the world will be guided by electronic brains and—intellectual dwarfs who will know too much of too little. Perhaps the millennium where both cultures flourish will forever remain to us a Land of Promise!

Five : Dipanjan Roychaudhury

I want to live and I want to understand life. I want to understand the people I meet every day, the people I hear of, the people I read of in the newspapers. I want to understand why some people are poor and others rich. I want to know why there is war and how we may do away with war. I want to think and know what others in all the centuries left behind have thought about subjects that seem mysterious yet fundamental to me —human suffering and endurance, happiness and sorrow, love, hate and fear. Further, I consider this knowledge and understanding that I seek to be vitally important to me. I feel that without it I shall somehow be crippled, incomplete.

I want to understand the world I actually see around me, the world I only sense, even the microscopic world inside the atom that I have only been told about, that I cannot see or touch or hold. I want to know why the planets go whirling round always in the same way and almost in the same paths round the sun. I want to know all about the tiny particles inside the atom which I am told constitute the stuff of which the world is made. I want to know how I live and breathe and walk, how a green sapling grows up into a mighty oak, how a tiny bud blossoms into an exquisite flower and the shuffling caterpillar turns into a butterfly. I want to learn how to analyse, how to reach deeply and systematically into the nature of things, and as before I feel that if I shut out this part of my life I shall not have lived fully.

But life is short and ability limited. I shall not be able to master all this knowledge. So, instead of dissipating my energy in a wild and fruitless venture, I shall follow up the particular branch in which I feel the greatest interest. But I must realise clearly that this is merely an act of expediency. I must realise that the two cultures are not sealed in watertight compartments and are actually complementary. With this in mind I must carry on with the work I have chosen, employing every chance minute I can snatch to glean what I can from the two cultures—both of them. It may be my fate to remain incomplete, but I must at least strive towards completeness.

THE PRESENT STATE OF GOVERNMENT STATISTICS IN INDIA

S. SUBRAMANIAN

OFFICIAL statistics fall into two classes, viz., economic and social, although the frontier between them is not very clearly demarcated in all cases. In fact, a large field consisting of employment, standard of living and similar statistics belongs to both sectors.

Economic statistics can be broadly divided into production, prices, trade, transport and communications and finance.

The main problem in relation to agricultural statistics has been that over a large part of the country, usable area statistics were not forthcoming until recently. Efforts made after Independence to obtain the necessary information from the erstwhile Princely States have borne fruit but progress is necessarily slow. In regard to data on yield of crops, sample crop cutting surveys have now begun to produce relatively more reliable figures but the demand for forecasts by commercial interests cannot be satisfied by such compilations. Thus the time-honoured impressionist method of estimating the condition of crops also survives in one form or another.

Data on industrial output are of more recent origin commencing as they do from the early thirties of this century. The system of voluntary returns worked fairly well in the initial stages but during the last War, the need for more and more comprehensive material had to be met by legislation in the form of the Industrial Statistics Act of 1942 followed

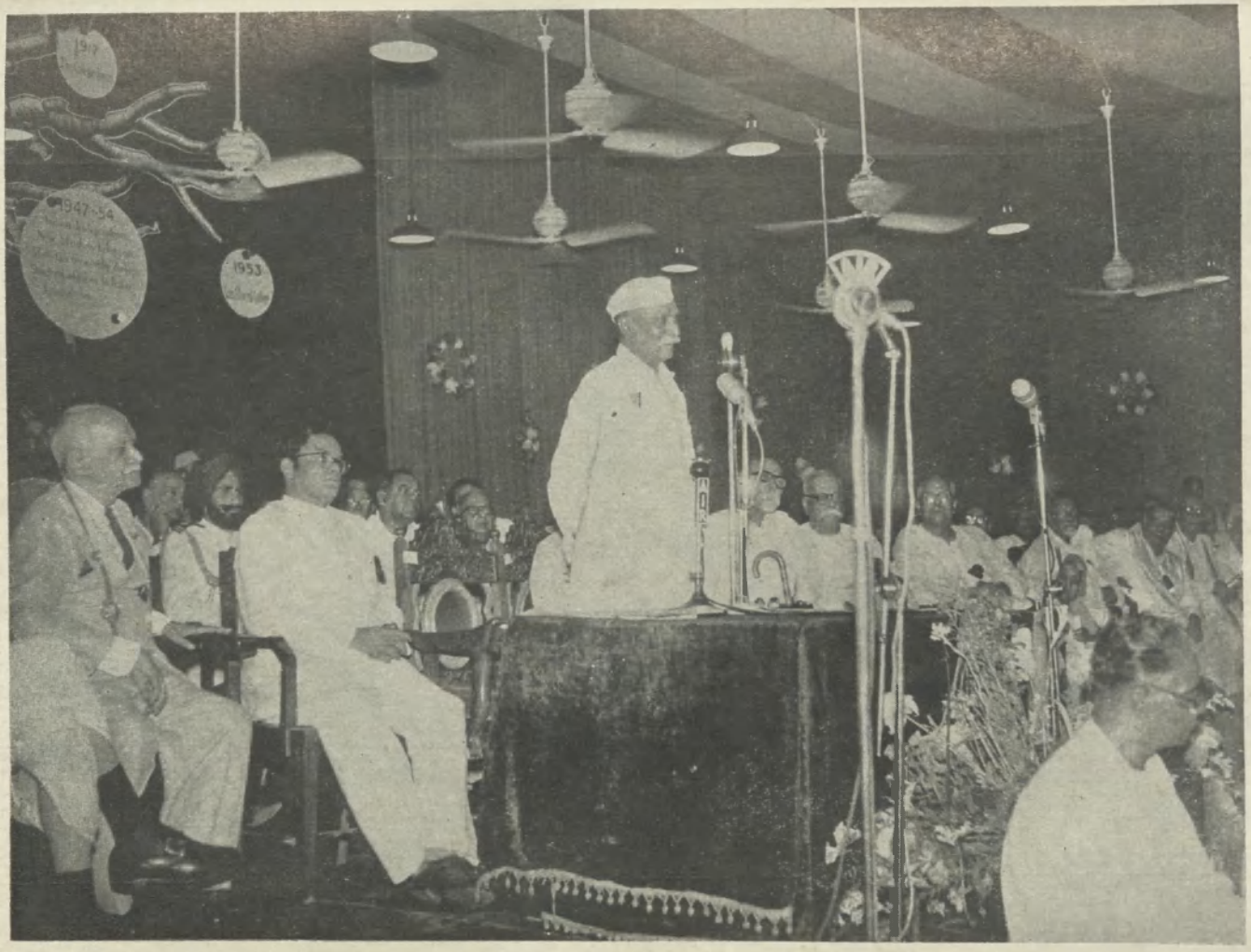

Dr. Prasad speaking in the centenary meeting

Dr. Prasad with the Union Council

by the Collection of Statistics Act of 1953. Response from units of production was not quite satisfactory in the beginning but with the growth of civic consciousness, there is better co-operation now from the producers. However, there are more 34,000 units coming under the Factories Act of 1948 employing on an average 10 or more with using power and 20 or more without power. It is not an easy proposition to extend the complete census to all the units but it is hardly necessary to do so. A scheme of sampling is now in operation covering all units employing more than 50 people and a representative selection from the other units is considered adequate for planning purposes. Industrial statistics are more trustworthy than the agricultural data but it should not be forgotten that cottage and small-scale industries which are estimated to account for something like 10 *per cent* of the total national output are beyond the purview of the existing surveys. It is to be hoped that National Sample Survey will be able to produce at least national aggregation in this field.

Price statistics comprise three or four different types of series, viz., wholesale prices, retail prices, harvest prices, i.e., prices received by the farmer and unit values of imports and exports. Wholesale prices and harvest prices are collected largely through the good offices of trade associations and banks but retail prices by their very nature require the direct attention of official agencies. Even fifteen years ago, information bearing on wholesale price variations was limited to a handful of commodities but gradually the stage has been reached at which more than 500 wholesale quotations are available to the Office of the Economic Adviser in the Ministry of Commerce and Industry. The Labour Bureau in the Ministry of Labour has a record of retail prices relating to industrial and rural centres over the length and breadth of the country. The Directorate of Economics and Statistics in the Ministry of Food and Agriculture has a good collection of data relating to prices received by the farmer. The Department of Commercial Intelligence and Statistics maintains a register of f.o.b. and c.i.f. averages of import and export items.

Very briefly, existing trade statistics can be sub-divided into foreign trade statistics and internal trade statistics. With regard to foreign trade statistics, our position compares very favourably with that of the most advanced countries in the world. On the other hand in the case of internal trade statistics such as inland and retail and wholesale trade, we are far behind. While coasting trade is fully covered all that we have in the matter of inland trade is a single publication which costs a good deal but covers only rail and river-borne trade. There is no information at all regarding road traffic. Overall figures by air freights are available but their utility suffers through lack of commodity details. Experiments are being made in the direction of compiling wholesale and retail trade statistics

but it is too early yet to promise the institution of any regular series of data.

Apart from statistics relating to road mileage and the number of vehicles registered which become available long after the period to which they relate, we had no transport statistics at all till very recently. Lately, however, a system of traffic surveys has been undertaken by the Roads Organisation attached to the Ministry of Transport and it can be hoped that more information under this head will become available in the near future. Railway and civil aviation mileage statistics are quite ample, however. Available postal statistics are not so well known but they include several items of research importance. Figures of small savings provide an example.

Financial statistics are capable of study in two parts, viz., private finance and public finance. A good deal of material with regard to banking and co-operation flows from the different departments of the Reserve Bank of India. Insurance statistics in the necessary degree of detail are released regularly every year by the Controller of Insurance in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The gap that existed in the field of company finance are being filled according to a carefully drawn up plan.

Public finance statistics used to be confined to the annual budget figures and the Combined Finance and Revenue Accounts published by the Comptroller-General with the setting up of an Economic Division in the Ministry of Finance. Closer attention is being given to the analysis of this wide range of data. Problems of economic classification in particular have been taken up for attention.

The various series of index numbers, wholesale prices, consumer prices (cost of living), profits, securities, declared values of import and export —all belong to one kind of derived statistics. They are being constantly improved with regard to both coverage and the system of weighting. Another category of derived statistics is composed of Balance of Payments and National Income which have been developed greatly of late.

Social statistics would cover numerous subject fields, e.g., education and literacy, health and nutrition, housing, living standards, migration and crime. The main sources of statistics relating to education are the reports published by the Department of Education at the Centre and the States. Moreover, data on literacy are gathered once in ten years through the Population Census. The Registrar-General and the Director-General of Health Services, New Delhi, collect statistics of births and deaths and of health and morbidity from the rural and urban areas where registration is compulsory. These data cover roughly 80 per cent of the total population of the country.

Methodical Research on the human diet goes on at the Indian Nutrition Research Laboratories in Hyderabad. Statistics of housing are scarce

but a rough idea in this regard can be obtained from the various family budget surveys held in different parts of the country in the context of the National Sample Survey, and cost of living index enquiries. Some light is also thrown on working conditions in industry generally by the annual surveys undertaken by the Labour Bureau of Government of India in Simla.

Migration statistics are obtained as an administrative by-product by the Passport Department of the Ministry of External Affairs. The population census also goes periodically into aspects of inter-state and foreign migration.

The category of crime statistics has been neglected for long. However, thanks to the interest evinced by the U. N. Social Affairs Department, viz., some field work has been started by the Ministry of Home Affairs, New Delhi, with a view to co-ordinating the material already existing in the police and court reports.

Apart from the above, multifarious subjects of social interest, the aged and infirm, for instance, can be tackled by suitable rearrangements of data available in the decennial population census reports.

A good deal of material is collected as the by-product of day-to-day work in Government departments, as for example, Custom Houses, Income Tax Offices, and so on. Apart from this, data are also obtained through statutory returns and also on voluntary returns in specified surveys. Where postal questionnaire are not expected to yield good results as in the case of family living studies, information has to be collected by personal interview. After obtaining all these basic data tabulation can be done by hand or by mechanical methods. Examples of both kinds of processing are many indeed. In collecting statistics from the field it is to be remembered that there can be cases of deliberate withholding or distortion or ignorance and laziness or even non-response. In processing there may be computational errors in rounding off, there may be break of continuity as for example due to partition. Missing bits of data have also to be filled in by estimation. Over and above all these the needs of international comparability have also to be kept in mind. Then again constantly a compromise has to be made between speed and accuracy. Confidentiality of information relating to individual respondents should be respected but secrecy of returns should not be allowed to extend to methods of compilation.

Except in the case of Population Census it cannot be said that the Indian Statistical Organisation is the result of any conscious planning. It has actually grown over the last hundred years advance through accidental reorganization in response to the passing needs of the time. There have been periods when there was excessive centralisation while there have also been equally noticeable periods of extreme decentralisation. In the result, during the last great war, the emergent requirements arsing from the total war resulted in an almost complete decentralisation of the various

statistics. After the War, problems of duplication and overlapping arose, and with a view to improving the situation a Central Statistical Office was set up in the middle of 1951 with defined functions. While the nature of a national organisation will depend very largely on tradition, it will be useful to keep in mind the working of the highly centralized organisations in the British Dominions and the USSR on the one hand with the fairly decentralised agencies of U.K. and U.S.A. on the other. In Canada in particular, the centralisation is complete and the only co-ordination that is attained in practice is based on the existence of all the branches under the same roof. In the U.S.A. the precise powers have been prescribed for the co-ordinating agency. In Britain co-ordination by the Central Office is purely informal. In the USSR a novel system of control through the supply of paper for the printing of forms and schedules has been in vogue for sometime.

In India we are giving a trial to the Committee method. The States have gradually developed well-knit statistical bureaus and it is really an advantage to have accounts of the working of these bureaus from year to year in the context of the actual functions of the statistical agencies in the Centre. We have an annual conference of Central and State Statisticians. It is also considered desirable to associate non-officials who alone, after all, could devote adequate attention to the study of inter-relations of the statistical series published by government offices.

TWO FILMS AND TWO EPOCHS

JAYABRATA BHATTACHARYA

'BATTLESHIP Potemkin' and 'Kanal'—here are two films so widely separated by time, and yet how well they reflect the ages they had set out to depict! From 1927 to roughly about 30 years later is a period that covers a very sizeable portion of cinematographic history. These three decades saw the cinema progress from a silent movie made on a shoestring budget (as 'Potemkin' essentially was) to a superbly realistic fusion of artistic capabilities and the latest fruits of scientific endeavour (as 'Kanal' on the whole is).

It remains for expert critics to judge whether Wajda was influenced by Eisenstein or not, and to evaluate the comparative merits of the two films, but the layman cannot help noticing their basic similarity: they both bring out faithfully the spirit of their respective countries. Other similarities will not be hard to find. When the Delhi Film Society showed 'Kanal' some years back, I found many people leaving during the sewer scenes. They later complained that the film was too horrifying to be everyone's cup of tea. The same thing happened when 'Potemkin' was unwisely screened at our College. Of the handful who attended the show, quite a few clattered down the stairs and noisily made their exit after the first quarter hour. The film was too realistic by half for them.

Taking everything into consideration, it is not surprising that eminent New York critics have voted 'Battleship Potemkin' the best film ever produced. If a film is judged by its impact, the sense of involvement it produces in the viewer, 'Potemkin' indeed is an all-time great. Apart from creating a wave of sympathy for the young Soviet Republic and heaps of accolades for Eisenstein, 'Potemkin' brought to the fore the creative possibilities of the cinema and established the right of this new technique to be considered as a medium of art.

Tendulkar, the well-known Indian critic, recounts in his book how one evening in the Cambridge of the late 20s, his friend David Guest (a gifted English student who later died heroically in the Spanish Civil War) dragged him to see 'Potemkin'. Tendulkar was so impressed by the all-round excellence of the film that he decided to visit Russia as soon as possible. His experiences in Russia form the latter part of the book. In fact, the same experience was being repeated in many European capitals. Young men found in the film a work of great artistic merit, an endeavour so full of power and vitality that it stirred the mind to creative thinking. Here was something new to all of them, an emotional experience which

was a revelation. The reactions varied from sympathy and admiration to direct identification, with Soviet ideals.

Sergei Eisenstein's task was to explain to a hostile world the events of 1917 by depicting the brutally suppressed uprising of 1905 (or at least one aspect of it), and this was made easier because the incident of the mutinous battleship was perfectly true. There is the stamp of historical infallibility in every portion of the narrative. Nevertheless, the story of how a number of sailors, disgruntled at Russians' blunders in the Japanese war and at the quality of meat supplied, revolted and threw the officers overboard, would have made a very mundane story.

It required Eisenstein's master touches to produce the most abiding of cinematographic efforts. The other helping factors must not be left out. Eisenstein had in Edouard Tisse a brilliant cameraman capable of extracting the best possible photographic results from every situation. Edouard and Sergei made a fine combination indeed, supplementing each other's deficiencies and co-ordinating the activities of director and cameraman.

The film starts tamely enough showing the daily activities aboard the flagship of the Black Sea Fleet. Trouble comes at mealtime when the sailors complain about the maggotty meat served to them. Up comes the ship doctor to examine the meat, and here we have the first glimpse of how well Eisenstein can use the minor characters.

The shrivelled-looking doctor is a brilliant portrait of timid craftiness only too obliged to please those wielding power. He peeps through a magnifying glass and despite the fact that the camera clearly shows the meat teeming with insects pronounces it fit to eat. At this some sailors throw their plates away.

The ship's captain orders all men to line up on the foredeck and we witness another superb performance. With all his decorative trappings and a hard beaverlike face the Captain is part and parcel of a degenerate, crumbling aristocracy. Those who refuse to take the meat are asked to step forward. A number of sailors do so, they are accused of mutiny, a canvas sheet is thrown over their heads and the firing squad called in. The tension is unbearable as the doomed men fidget below the canvas and a priest pronounces benediction. This is an unforgettable scene; the bearded man of God silhouetted against the drop of the sky blesses those about to die, his face a picture of agony, while the wind ruffles his long robe and the music rises in a crescendo.

Then the unbelievable happens—the firing squad refuses to fire. Mutiny breaks out, the officers are dealt with swiftly and the delighted sailors find themselves in command of the pride of the Russian Navy. Event follows event; the lone sailor killed during the uprising is given a hero's burial, the people of Odessa turning out in full force to pay homage

and to greet the rebels. And it is now that Eisenstein prepares to depict one of the most senseless massacres in history—the memorable Odessa Steps sequence.

Down the longest flight of steps in the world, comes an endless mass of people to see one revolutionary ship. And then suddenly the harsh rhythmic tramp of marching boots! The camera which was following the progress of a mother pushing a pram down the steps, now lifts its eye up and glimpses a file of soldiers marching down the steps. First we see their legs, the rifles extended to firing point in their hands, and then the caps on their heads—the Cossacks. The camera turns away, as if in fright, and then watches the fleeing crowd. The staccato roar of the rifles wipes out everything, and when the smoke clears, the steps are littered with the dead and the dying. The pram bereft of a mother's guiding hands rolls down the steps and from a distance we see two tiny feet kicking out in an eloquent protest. A cripple hobbles into view, trying to escape the bullets; he stumbles and falls while the soldiers lower their rifles to aim at the prostrate figure.

The brutality does not go on for long. The guns of the Potemkin open up in protest against this mass murder, and a full-fledged mutiny is on. The rest of the film is not so existing but Eisenstein does not for a moment relax his vigilance. The artistic standard remains uniformly high. A whole fleet is sent to hound out the Potemkin and the film ends with the sailors in the pursuing ships allowing the Potemkin to pass through unmolested. The sailors in all the ships throw their hats up in joyous greeting to the rebels, while the officers watch on helplessly. The film ends happily (to use a trite word). One does not feel depressed at the end. And this is what marks an important difference with 'Kanal'.

When 'Kanal' ends, the hang-over, so to say, persists long after. If Eisenstein started this realism business, Wajda carried it to its logical extreme. The chief reason is that Wajda is a Pole, the most martyred people in history, and what he portrays in 'Kanal' is not a successful uprising, but perhaps the most tragic one since the Middle Ages. It is the Warsaw Uprising of 1944 when the Allies stood by and watched a heroic band of citizens defy the might of the Wehrmacht for days on end. At one stage they captured the whole of Warsaw, but famished because of lack of food and water, helpless because of shortage of ammunition, they admitted defeat before the onslaught of a whole German division. Surrender they did but not before one last supreme effort—an attempt to escape through the city's underground sewers. And it is their desperate will to live but not as captives of the Germans, that provides the subscript to the title: 'They loved life'.

The characters in 'Kanal' are intensely human. To bring out this humanity requires strenuous and vigorous acting. Only a director of

Wajda's calibre can induce from his actors this depth and sincerity. We might as well say at this stage that in 'Kanal' there is no hero and heroine stuff. Each member of the cast is a protagonist and this affords the purest histrionic possibilities to every actor. The story is simple (how an isolated resistance unit fights or life above the ground and in the sewers, and how each member is gradually ferreted out by the Germans until the last supremely tragic scene) but because of its very nature calls for perfect teamwork. This I suppose was drummed into the actors by the director: they are out to depict a team of human beings who lived and died as such, and therefore the stars must themselves work in a well-knit unit.

Andrzej Wajda perhaps realised that to depict motion and emotion successfully he must keep the actors or the camera or both moving as and when necessary. This technique, first employed by Eisenstein and later perfected by others (Bergman, Reed—to mention two), has been excellently used here, coupled with an imaginative use of sets in the earlier scenes. Though the photographic technique is intelligent, the camera maintains for the most part an aloofness like that of a discreet observer, despite coming in for a few exciting close-ups. This aloofness has led people to complaints that Wajda's style is unemotional, his narration of events devoid of passion. There is certainly a great amount of passiveness in 'Kanal'; Wajda seems content with taking a bird's eye view of events without taking sides or employing obvious gimmicks to show his affiliations. Cynicism there is in plenty but it is cynicism born out of suffering, and the mask of unemotionalism hides very deep feelings. It is but the reaction one would expect from a gifted and sensitive observer.

The power and passion, the grief and sorrow—they are all present beneath the surface. We are only given a few glimpses of these feelings as in the scene in the sewer when the group, after days of darkness, see sunlight peeping through an opening. The members of the group rush up thinking it is an opening leading out of the sewers, and find they have reached the banks of the Vistula, but the small window through which light is streaming in, is barred. And of course the last scene—which is surely one of the most moving in the history of the cinema! The Commander of the insurrectionary group and his aids are the only one who succeed in escaping from the sewer. They come up, blink in the strong sunlight and discover that the others are still in the sewer and presumably still hunting for an opening. The Commander is furious at his aide who has all along been telling him that the others are following them close behind. It is a breach of military discipline and the aide must pay for it. The Commander shoots him and with an agonised cry of 'My company, where is my company?', once more descends down the sewer to search for his last comrades. We see a hand drawing down the lid of the opening.

The street in empty save for the dead body, and the last shot is of the wind blowing along stray pieces of paper.

A successful mutiny and one that failed—what do the films depicting these two unlike and widely separated (in time) events have in common? The same humanism that invests, in whatever medium that is chosen, the insignia of greatness. Brutally realistic, both the films employ realism as a devise to carry through their message.

'Potemkin' tells how tyranny carries with it the seeds of its own destruction, while 'Kanal' warns against the consequences of this very tyranny getting the upper hand. Poland has suffered much, and by reflecting this suffering, 'Kanal' reminds humanity of the misery brought about by man's cruelty to man.

MOZART : *the early rebel*

UMA DASGUPTA

IT was some two hundred years ago that Mozart lived. He lived and worked for only thirty-six years. And he died when the world looked exciting and young. Sensational things happened to music almost immediately after he was dead. But Mozart started much of what was to follow. And when all the shouting had died down, Wolfgang Mozart is still there—quietly secure in his achievement.

But the promise of Mozart's beginnings spoke of no radical departure. He was the son of Leopold Mozart, a musician in the Orchestra of the Archbishop of Salzburg. He had a sister, Nannerl, five years older than he, who also showed definite musical talents. Clearly a musical family. But Mozart astonished them all. His mind was completely dead to all other things. Even his childhood games had to be played to the accompaniment of music, if they were to be of interest to him. The Piano-keyboard in fact was his dearest playmate, at which he played as other boys play with soldiers or railway-trains. Even at the tender age of three Wolfgang showed an interest in the clavier. And, at four he composed his first small pieces for the clavier. This was undoubtedly precocious talent. But Mozart senior had definite ideas as to what the boy should do. True the child showed astounding precocity. But this was only to be exploited to build him up as a 'prodigy.' Later he would settle down to

a mediocrity similar to his father's. This was the destiny of the small world.

The father's guiding hand came into action quite early. The two children, Wolfgang and Nannerl, started off as concert-tourists in 1763. Wolfgang was then only seven. And yet his performances proved his in-born genuis. Visiting Vienna, Berlin, Amsterdam, Paris and London, Wolfgang played to charmed audiences on the harpsichord, organ and violin. At St. Janes' Palace he played pieces by Bach and Handel at sight. Europe hailed a child prodigy. But of course the prodigy was not yet a master. The pieces published in Paris and in London at this time were no sure criterion of Mozart's ability as a composer. These pieces were in fact revised and corrected by the experienced hand of his father.

Thus passed four more years in Mozart's life. In writer they were back home in Salzburg. Here Mozart senior resumed his duties to the Archbishop. The young Mozart was also kept busy by commissions from the Archbishop and others who wished to make use of the new celebrated young genius. Wolfgang, at this time, composed a number of symphonies, arias, serenades and masses. His first two operas, *La Finta Semplice* and *Bastien and Bastienne* were also composed at this time. These were Mozart's juvenalia, but certainly not insignificant for that.

Soon after came young Mozart's second tour. This time father and son went to Italy. At Bologna, Wolfgang received his final schooling from the renowned Padre Martini. Here in the Sistine Chapel, Mozart heard Allegri's famous *Miserere,* performance of which outside St. Peters was forbidden by the Pope. But Mozart was too deeply moved and therefore determined to master the piece. He wrote out the eight-part work from memory after hearing it once. He returned the next day with the manuscript concealed in his hat, to hear the work again and correct his mistakes. The Pope came to know of this but did not take it seriously. In fact, he was pleased and conferred the Knighthood of the Golden Spur on Mozart.

On his way back to Milan for the production of his opera, he was admitted after a severe examination to membership of the Philharmonic Society of Bologna, at the unprecedented age of fourteen. In spite of the misgivings aroused by the age of the composer, the opera, *Mithridates, King of Pontus,* pleased both the singers and the public, and the *Cavalier Filarmonico* was hailed and applauded. *Mithridate* was given twenty performances during the season. The membership of the Philharmonic Society of Verona was added to Mozart's honours. He received a commission to compose a dramatic serenade for the approaching marriage of the Archduke Ferdinand. Here was the climax of Mozart's infant fame. And amid this blaze of glory, the boy passed into manhood.

The next few years in Mozart's life were spent quietly in Salzburg. He was engaged as a musician in the service of the Archbishop. But now

his unhappiness began. The Archbishop was a thoroughly prosaic man and could not appreciate the young musician's impulses. Mozart, moreover, found it difficult to reconcile himself to the narrow and restricted circumstances in Salzburg. The Archbishop's Palace became young Mozart's prison. Yet though unhappy, Mozart did not forget his music. These were the years when he produced some of his most notable church-music compositions. They were the *Exultate, Jubilate* (containing the famous "Hallelujah") and the *Sancta Maria.*

This interlude at Salzburg was broken by a trip to Paris. In this tour, Mozart was accompanied by his mother. On way to Paris, Mozart stopped to hear the famous Mannheim Orchestra. He was highly inspired by the Orchestra, especially the clarinet—a new instrument which became the dearest of all to him. At Mannheim also Mozart fell in love with a young singer, Aloysia Weber. This love however ended in disappointment.

The visit to Paris was not much of a success. The Parisiennes, it seemed, did not have much time for Mozart. His hopes for an opera came to nothing. The only work he composed for the Parisian stage was the ballet, *Les Petits Reins.* Yet even this did not receive adequate commendation. The situation became desperate when Mozart's mother suddenly fell ill, and died. Mozart was now almost alone in the world. Soon he had to return to Salzburg. This was a return to an old happiness.

This time he was commissioned as Cathedral organist and Commissioner to the Archbishop. Mozart responded with a good volume of Church music. Other important works were also composed at this time, including the *Concerto* for two pianos in *E Flat,* and the *Sinfonia Concertante* for violin, viola and orchestra. In 1780 he was commissioned to write an opera for the Elector Karl Theodor, who had recently moved to Munich. Extremely enthusiastic over this work, Mozart produced his first great dramatic work, *Idomeneo.* This proved to be his best opera seria.

At this point, Mozart's life began to change. He could not keep on good terms with the Archbishop. The ever-recurring requests for leave to go on concert-tours irritated the Archbishop. Mozart again could not reconcile himself to dependence on another. The break therefore came in 1781, during a visit to Vienna. In a stormy scene Mozart was vilely abused, and when he went to tender his resignation he was literally kicked out of the door by the Archbishop's Secretary. Intensely agitated, Wolfgang wrote home to his father. The father, who knew his place, was inclined to the Archbishop's side in the quarrel.

The break with the Archbishop was of decisive importance to Mozart's career. He was now free and independent. He acquired greater self-respect. He found wider scope and his talents spread themselves in every musical sphere. Even his compositions became more individual. He had no more to submit to dictation. His compositions were his own. He

refused to cater to public taste. He composed what appealed most to him: bold harmonies with distinctive orchestral works. All this worried Mozart's father. His mind worked in the old grooves of a small world and he was afraid his son would become unpopular. But the young musician was no longer the timid son of a dominating father.

Vienna became Mozart's permanent abode. Here Mozart started a new life. He began triumphantly both as composer and pianist. He settled down to a happy, married life. His wife was musical, too, and had a fine singing voice. She was Aloysia Weber's sister, Konstanze. In Vienna, Mozart wrote his last six symphonies. Thus the "Vienna" period marked his peak as a symphonic composer. These symphonies of Mozart heralded a new era in musical form. Till now, the symphony had been typical entertainment music. They were written for noblemen and their orchestras by their own composer-conductors. The social and political upheaval caused by the French Revolution brought with it a change in music and art. Artists and musicians began to realize their worth. They no longer wrote music for entertainment of the leisured class. Their compositions began to give a more complete expression to their own personalities. Mozart was in the vanguard of this tendency. His last four symphonies, for example, mark a complete break with conventional music written to order. These were the *Haffner Symphony*, the *Linz Symphony*, the *Prague Symphony* and the *Symphony in E Flat*. The little world of Salzburg had been left behind.

The new setting was congenial. Even old pillars of society lent their support to the rising structure. Mozart was now an established and well-reputed musician. He attracted the attention of the German Emperor Joseph II. The Emperor in fact commissioned him to write for the German Opera. Mozart thus produced *Il Seraglio*. Pleased with the work, the Emperor appointed Mozart Chamber-musician and Court-composer.

Mozart was a popular man. He had a wide circle of friends of all classes: nobility, bourgeoisie and artists. Of his aristocratic friends, Baron von Sivicten is the best known. But Mozart's greatest friendship was of much influence on Mozart's musical development. This influence is specially apparent in the six *string quartets*. The musical language of these quartets was at that time so radical that none of Mozart's contemporaries was able to appreciate them. These quartets were also dedicated by Mozart to Haydn.

The "Vienna" period also saw the long series of Piano Concertos. In them Mozart probed a new dimension. They reflect the difficult time he had in 1784, when he was stricken by a serious illness and worried by thoughts of death. He began to ponder religious problems and in the end became a Freemason. There were twenty-three *Piano Concertos* in all, and it was Mozart who gave the concerto its definite form. His most signi-

ficant contribution was the balanced interplay between solo instrument and orchestra. The solo instrument does not dominate the orchestra, as in the works of Bach and Brahms. In Mozart's works, solo and orchestra maintain an equilibrium by development "rivalry."

Mozart's acquaintanceship with Lorenzo da Ponte was of great importance to his development as a dramatic composer. Da Ponte, a Venetian abbot who had been born a Jew, was a remarkable combination of priest, adventurer and litterateur. It was he who wrote the libretto, based on Beaumarchais famous play, for *The Marriage of Figaro.* While working on this opera, Mozart completed a number of other works, including the "Masonic Funeral Music." *The Marriage of Figaro,* one of the greatest of Mozart's works, was not much applauded in Vienna. It was in Prague that this opera received its most enthusiastic reception. The Prague reception filled Mozart with happiness. Excitedly he wrote home: "No one here talks of anything but Figaro; they play, sing and whistle nothing but Figaro; and they go to no other opera than Figaro. It is Figaro all the time."

After *The Marriage of Figaro* came *Don Giovanni.* This was one of Mozart's mightiest works. It was staged in Prague and was a big success. But Mozart's happiness was ending.

Though still very young, Mozart began to deteriorate in health. In spite of all the music he produced, he was poor and very much in need. And when he realized there was no escape from this poverty, he weakened physically. Time and time again he was compelled to borrow money—and that, at great cost. After production of *Don Giovanni,* Mozart was appointed Imperial Court Composer on a salary of only 800 florins a year. This income could not save him. All his other sources of income failed completely. In desperation, Mozart wrote his last three symphonies, those in *'E' Flat, 'G' Minor,* and *'C'.* Yet these works reflected his vexations and worries.

Further, they did not improve Mozart's financial position. A concert tour to Berlin was again a financial failure. When he came home, he had again to make earnest appeals to Puchberg, his Freemason friend, for funds. An added burden was the continual illness of his wife. Her frequent visits to a health resort in Baden added to Mozart's debts.

Yet in all these misfortunes, Mozart worked away on his music. His biggest and most notable work was the opera *Cosi fan tutte.* In the last year of Mozart's life his powers flared into life again. Some of his greatest works, including the *String Quartets* in "D" and "E" Sharp, the *Piano Concerto* in *"B" Flat,* the *Clarinet Concerto* in "A", the opera *"The Magic Flute"* and the *Requiem Mass* were written. *The Magic Flute* was composed during the spring and summer of 1791. While Mozart was busy on *The Magic Flute,* thoughts of death returned to haunt him. He

became convinced that his end was near. This feeling was much strengthened when he was secretly commissioned by a mysterious stranger to compose a Mass for the Dead.

This time he was right. His physical condition grew worse. He could not take his mind from death. And yet to the very last day, he was true to his music. He was still working on the Requiem Mass when he died, December 5, 1791. It was a lonely death and his burial was carried out as cheaply as possible. Mozart's music died out to the echo of Beethoven's arrival.

Members of the English Department with Profs. T. P. Mukherjee, S. Chakrabarty, S. Mahalanobis on the occasion of their farewell

DEPARTMENT OF ENGLISH

Professor Tarapada Mukherji's Farewell

Professor Tarapada Mukherji, who had taught at the Presidency College for thirty-one years and had created a personal tradition as only a few other teachers of English, in the long life of the College, had done, reired on 24th December, 1962. The farewell meeting, held on the 9th February in the Arts Library hall, was presided over by Dr. S. K. Banerji. At this meeting of colleagues, friends and students, Professor Taraknath Sen, now Head of the Department of English, paid the homage of the Department, to which he added his personal tribute; another tribute, this one from an old colleague, was that of Dr. Subodh Chandra Sengupta. Of former and present pupils, the privileged few who spoke on the occasion recalling gratefully the experience of reading Shakespeare or Victorian poetry with this great teacher were Professor Dilip Kumar Biswas, Professor Jashodhara Sen Gupta (of Lady Brabourne College), Sri Samik Banerjee and Srimati Sukla Roy. Visibly moved, Professor Mukherji rose to reply after the President Dr. S. K. Banerji, his teacher whom he adores, had spoken admiringly of him; many who heard him were equally moved.

At the conclusion of the meeting the vote of thanks was moved by the Secretary of the English Seminar, Sri Mihir Bhattacharyya, and Rabindranath's "মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমায় কার গো নমস্কার" was sung by Srimati Indrani Bhattacharyya, Srimati Shyamasree Bagchi, and Srimati Shyamali Ganguli, three former students. We reproduce here the text of the farewell address (read by Srimati Jyotsna Bhattacharya, a lecturer in English at Jadavpur University).

To

PROFESSOR TARAPADA MUKHERJI

Sir,

The humble tribute we pay to-night is prompted by the warmest feelings of reverence and unspoken gratitude rising in minds you have shaped and guided for thirty-one years. You interpreted for us works of great poets and dramatists and your delight in reading their works became your pupils'. You never touched a poem or a play which was not transformed by your depth of feeling and insight. You should not rest till you saw its native loveliness revealed to us. It is our good fortune that your presence never failed to awaken in us a keen appetite for the finer pleasures of poetry.

The admiration which your learning and eloquence drew from us was strengthened by the deep affection you inspired in all. We never felt we had anything to hide from you—least of all, our ignorance. We always found you affable, generous and just, and the close, personal interest you took in each student fortified our loyalty. By uniting the authentic temper of a scholar with exemplary patience, magnanimity and understanding you gained the true popularity that takes deep root and spreads itself wide.

As this hour of farewell brings back all that the long years have scattered, a thought rises above the grief of imminent parting: that you leave with us a permanent heritage. May the unfading splendour of the years you spent at this College be crowned with a long life of well-earned rest!

We remain,
Sir,
Bound to you as ever in ties of love and gratitude,
Your former pupils at Presidency College.

Presidency College,
Calcutta.
February 9, 1963.

[There was a surplus of Rs. 218.40 out of the funds generously contributed by pupils and colleagues, past and present, of Professor Tarapada Mukherji in connexion with the farewell. The surplus has been disbursed as follows:—

Donated to the Students' Aid Fund of the College in honour of Professor Mukherji .. Rs. 109.40

Donated to the distressed family of Subodhkumar Maiti, deceased bearer of the College .. Rs. 109.00]

The English Honours Library

The English Honours Library, founded in 1926 by the late Professor Prafulla Chandra Ghosh of hallowed memory, is now in the 37th year of its existence. Since January 1963, when the undersigned took over as Secretary to the Library, 14 books have been added to stock, including 5 books received from Miss Dinaj Dastoor, ex-student. At present, there are 36 members using the Library and from February to September there have been 275 issues.

Subhas Basu,
Secretary.

FAREWELL TO DR. BHABATOSH DATTA

Dr. Bhabatosh Datta, Head of the Economics Department, was transferred last year to join the Writers' Buildings as Director of Public Instruction. The loss to the students will be realised by those alone who have heard him teach. The suddenness of his departure gave us no chance to arrange a fitting farewell. But, in the small function held in the Economics Seminar Library, what was lacking in preparations was much more than made up by the warmth and sincerity of the students who squeezed in and filled up the room to the last inch. And when in concluding his address, Dr. Datta said, "... Once one has been in the Presidency College, one is never away from it," we felt again that, for once, the gain of those who were putting him within the enormous wheels of administration was much less than the loss of the students he left.

Presidency College Centenary Volume : 1955

Published in 1956 Pp. 372+71 plates

Price: Rs. 5

Obtainable at :

(1) West Bengal Govt. Press, Gopalnagar Road, Alipore, Calcutta-27.

Mail Orders :

(2) Govt. of West Bengal, Publications Sales Depot, New Secretariat Buildings, Hastings Street, Calcutta-1 (Cash Sales)

VISITORS FROM ABROAD IN 1962–63

Sir John Sargent, M.A. D.Litt., formerly Education Commissioner with the Government of India, who came to West Bengal under the Colombo Plan in connection with the extension of University and Technical Education, visited the College on the 8th January 1962.

The following delegates to the Commonwealth Education Ministers' Conference held at New Delhi, visited the College on the 30th January 1962:

BRITISH DELIGATES

Miss M. Miles, Headmistress, Mayfield School, Putney, London.

Mr. E. E. Temple, Assistant Secretary, Association of Universities of the British Commonwealth.

AUSTRALIAN DELEGATES

Miss J. L. Miller, Committee Secretary, Australia.

Mr. E. J. B. Foxcroft, First Assistant Secretary in the Commonwealth Prime Ministers' Department.

NEWZEALAND DELEGATES

Mr. D. J. Richards, Third Secretary, High Commission of New Zealand in London and Secretary to the delegation.

Mr. Sol. Sanders, Regional Editor, U.S. News and World Report, visited the College on the 11th August 1962.

Dr. J. A. Kolman, Associate Professor of Mathematics, University of Auckland, New Zealand.

Mr. A. P. Weaver, M.A. (Cantab.), Education Officer, British Council.

CALIFORNIA UNIVERSITY STUDENTS

August, 1963—Under the 'Project India' Scheme—a group of students from the California University visited the College.

OBITUARY

Prof. Sisir Kumar Mitra

The present year has seen the demise of several illustrious ex-students of Presidency College. A name which readily comes into the mind in this connection is that of Professor Sisir Kumar Mitra, D.Sc. (Cal.), D.Sc. (Sorbonme), F.R.S., Padma Bhusan.

He got his M.Sc. from this College in 1912, winning a gold medal. He got his D.Sc. from the University of Calcutta in 1919. Among several institutions where he had worked, those worth special mention are Sorbonne University, Mme. Curie's Institute of Radium, Department of physics, Calcutta University, Radio Research Committee, Council of Scientific and Industrial Research, Institute of Radio-Physics and Electronics. It was under his inspiration that Calcutta University became the first Indian University to introduce specialised study of wireless communication in its Physics course.

Dr. Mitra was made a National Professor in 1962. Among his publications are 'The Upper Atmosphere' and 'Active Nitrogen.'

Dr. Radha Kumud Mukhopadhyay

The death on 9th September, 1963, of Dr. Radha Kumud Mukhopadhyay has been mourned by all teachers and students of history in the country. To our College, his death brings a deeper sense of loss, for he was one of those students who do not pass out of memory as soon as they pass out of college.

Winner of the Cobden and Mauat Medals of this College, Dr. Radha Kumud Mukherji, Padma Bhusan, was connected with several Universities and organisations for historical research of the country. A writer of international repute Dr. Mukherji was a prolific writer on Ancient Indian History and Art and on the Economic History of the country.

We offer our solemn tribute to the memory of the illustrious man.

Dipak Ghosh

Born 6th January, 1941; died 21st September, 1963. Death is always unexpected, but the death of a young man is a shade more grim than a man of ripe age. For one thing, it constantly brings to mind not only what the man was but also what he might have proved to be. In this obituary, we cannot speak of 'achievements' in the usual sense of the word. Dipak had his talents; his popularity was neither cheap nor undue. But at best, they were but a prologue to greater things.

He joined this institution in 1959, after going through St. Xavier's School and St. Xavier's College. He had already made his mark as a sportsman, and during his four years' stay in the Presidency College, he simply tantalized us with the bat, the ball and the table-tennis racket. His centuries were numerous each season, and numerous were his boundaries and over-boundaries. Some of his innings including the three-figure one he played against St. Xavier last December, still cling to the cricket-lovers of this College. In an inter-class match in the '61-'62 season, he hit a dashing pre-lunch 194, which remains the highest individual score hit by a student of this College. He was also a regular player of the Tapan Memorial Club.

Though he was remarkably proficient in Mathematics, he did not have much of what is known as 'examination luck'. To his teachers, he was well-behaved; his intimate friends will remember him as a merry lad-about-town, dominating a table at the coffee-house with a high-pitched voice and flippant counter-thrusts.

Dipak belonged to the same family as the late Professor Prafulla Chandra Ghosh of this College. He is survived by his mother, grand-mother and sisters, to whom we offer our heartfelt condolences.

Dipak Ghosh

CONTRIBUTORS

SRI SAURIN ROY: Student of 6th year History class—excellent, besides history, in Indian Classical Music (Vocal).

The article being written about a year back, the author, now obviously more matured and less headstrong, feels that he should, after all, reconsider this diagnosis of Dr. Bernier, especially as a new light has very recently been thrown on the Mughal agrarian set-up by Dr. Irfan Habib of Aligarh University. But this reconsideration can only be undertaken after a careful study of the book and, as such, is not possible in this edition.

SRI KALYAN KUMAR MUKHERJEA: Graduated from this College in 1962 with Honours in Physics and is now an ex-student, studying Mathematics in Cambridge. Plays the Sarode well, and also, always helps the listener in appreciating his composition.

SRI AVIJIT GUPTA: Student of 6th year Geography class. Himself the editor of the magazine of the Geography Dept. of the Calcutta University, has been, for the editors of this magazine, a rather disturbing contributor to tackle.

SRI DIPANJAN ROYCHOWDHURI: 3rd year (Degree Course) Physics. Enthusiastic, well-spirited, election-minded student and an ace debater. Has contributed also in the symposium 'The Two Cultures and I' published in this magazine.

SRI AMITAVA BAGCHI: 3rd year (Degree Course) Physics Honours. Though brilliant in their own subject he and Dipanjan have not given up interest in literature as a bad job, as is testified by their articles.

MISS RANU GUHA: 6th year History. Also studies Law. Has ably represented the College in many debates and discussions. Has appeared on the stage in several Sanskrit plays.

SRI SURJA SANKAR ROY: 3rd year (Degree Course) English Honours. One of the few students who have studied Urdu literature in the original. A good speaker.

SRI MUKUL MAJUMDAR: 3rd year Economics. Famous for scoring fabulous marks in School Final and Pre-University examinations.

S. SUBRAMANIAN: Director-General, Department of Commercial Intelligence and Statistics, Govt. of India. The article published here is a summary of the paper he read in the Statistics Seminar of the College on 'The Present Stage of Govt. Statistics In India'.

SRI JAYABRATA BHATTACHARYYA: 3rd year Economics. Has actively assisted in the publication of "Cosmos", "Samlap" and other student-magazines. Is organizing a club called "The Young Calcuttars." Interested in foreign students, globe trotting and debate.

MRS. UMA DASGUPTA: 6th year History. Interested in music and art. Able debater. Secretary of the girls' Common-Room (1961-62). She wrote on Chopin in the last issue of our magazine. Well-known for her cultural activities.

Statement about ownership and other particulars of the Presidency College Magazine:—

1. Place of publication	..	Calcutta.
2. Periodicity of publication	..	Yearly.
3. Printer's Name	..	Principal, Presidency College.
Nationality	..	Indian.
Address	..	86/1, College Street, Calcutta-12.
4. Publisher's Name	..	Principal, Presidency College.
Nationality	..	Indian.
Address	..	86/1, College Street, Calcutta-12.
5. Editors' Names	..	(1) Badal Mukhopadhyay, (2) Mihirranjan Bhattacharya.
Nationality	..	Indian.
Address	..	Presidency College, Calcutta-12.
6. Names and Addresses of the individuals who own the newspaper or publication	..	Presidency College.

I, Sanat Kumar Basu, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ S. K. BASU,
Publisher,
Presidency College Magazine.

The magazine is printed and published in the official capacity of the Principal. The name of the present Principal is Dr. Sanat Kumar Basu.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15	Pramatha Nath Banerjee, B.A.
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta, B.A.
1917-18	Saroj Kumar Das, B.A.
1918-19	Amiya Kumar Sen, B.A.
1919-20	Mahmood Hasan, B.A.
1920-21	Phiroze E. Dastoor, B.A.
1921-22	Syama Prasad Mookherjee, B.A.
1921-22	Brajakanta Guha, B.A.
1922-23	Uma Prasad Mookerjee
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta, B.A.
1925-26	Asit Krishna Mukherjee, B.A.
1926-27	Humayun Z. A. Kabir, B.A.
1927-28	Hirendra Nath Mukherjee, B.A.
1928-29	Sunit Kumar Indra, B.A.
1929-30	Taraknath Sen, B.A.
1930-31	Bhabatosh Dutta, B.A.
1931-32	Ajit Nath Roy, B.A.
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar, B.A.
1933-34	Nikhilnath Chakravarty, B.A.
1934-35	Ardhendu Baksi, B.A.
1935-36	Kalidas Lahiri, B.A.
1936-37	Asok Mitra, B.A.
1937-38	Bimal Chandra Sinha, B.A.
1938-39	Pratap Chandra Sen, B.A.
1938-39	Nirmal Chandra Sen Gupta, B.A.
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin, B.A.
1940-41	Manilal Banerjee, B.A.
1941-42	Arun Banerjee, B.A.
1942-43	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	Sudhindranath Gupta, B.A.
1948-49	Subir Kumar Sen, B.A.
1949-50	Dilip Kumar Kar, B.A.
1950-51	Kamal Kumar Ghatak, B.A.
1951-52	Sipra Sarkar, B.A.
1952-53	Arun Kumar Das Gupta, B.A.
1953-54	Ashin Ranjan Das Gupta, B.A.
1954-55	Sukhamoy Chakravarty, B.A.
1955-56	Amiya Kumar Sen, B.A.
1956-57	Asoke Kumar Chatterjee, B.A.
1957-58	Asoke Sanjay Guha, B.A.
1958-59	Ketaki Kushari, B.A.
1959-60	Gayatri Chakravarty, B.A.
1960-61	Tapan Kumar Chakravarti, B.A.
1961-62	Gautam Chakravarty, B.A.
1962-63	Badal Mukherji, B.A. Mihir Ranjan Bhattacharyya, B.A.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

1914-15	Jogesh Chandra Chakravarti, B.A.
1915-17	Prafulla Kumar Sircar, B.A.
1917-18	Rama Prasad Mukhopadhyay, B.A.
1918-19	Mahmood Hasan, B.A.
1919-20	Paran Chandra Gangooli, B.A.
1920-21	Syama Prasad Mookerjee
1921-22	Bimal Kumar Bhattacharjyya
1921-22	Uma Prasad Mookerjee
1922-23	Akshay Kumar Sirkar
1923-24	Bimal Prasad Mukherjee
1924-25	Bijoy Lal Lahiri
1926-27	Lokes Chandra Guha Roy
1927-28	Sunit Kumar Indra
1928-29	Syed Mahbub Murshed
1929-31	Ajit Nath Roy
1931-33	Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34	Girindra Nath Chakravarti
1934-35	Sudhir Kumar Ghosh
1935-36	Provat Kumar Sircar
1936-37	Arun Kumar Chandra
1937-38	Ram Chandra Mukherjee
1938-39	Abu Sayeed Chowdhury
1939-40	Bimal Chandra Datta, B.A.
1940-41	Prabhat Prasun Modak, B.A.
1941-42	Golam Karim
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	Jibanlal Dev
1947-48	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Sourindramohan Chakravarty
1950-51	Manas Mukutmani
1951-52	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Jyotirmoy Pal Chaudhury
1953-54	Pradip Kumar Das
1954-55	Pradip Ranjan Sarbadhikari
1955-56	Devendra Nath Bannerjee
1956-57	Subal Das Gupta
1957-58	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Rupendu Majumdar
1960-61	Ashim Chatterjee
1961-62	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Alok Kumar Mukherjee